সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান ১

চিরায়ত ও বৈপ্লবিক বিজ্ঞান

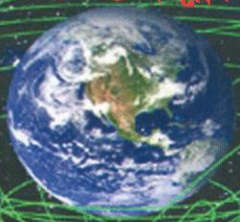

কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা

আপেক্ষিকতায় স্থান-কাল

দুর্ঘটনা কবলিত এপলো-১৩

উপগ্রহ কেন ঘুরতেই থাকে?

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

চিরায়ত বিজ্ঞান হচ্ছে গ্যালিলিও নিউটনের গতিবিদ্যা এবং পরবর্তী সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বের সমন্বয়ে পদার্থবিদ্যার চিরায়ত রূপ। বিজ্ঞানের অনেক শাখার আদর্শ আর ভিত্তিভূমি হিসেবে আজ অবধি কাজ করছে এটি। সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞানের আলোচনায়ও তাই শুরুতে চলে আসে এর কথা। অবশ্য আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব পরে বিজ্ঞানের এসব মৌলিক ধ্যান-ধারণায় কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সহজ ভাষায় এই তত্ত্বগুলোর সঙ্গেও আগ্রহী সাধারণ পাঠকদের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা রয়েছে এখানে; কারণ বিজ্ঞানের সমসাময়িক অগ্রগতির অনেকগুলো এদের ছাড়া সম্ভব হতোনা। অগ্রগতিগুলো সাধারণভাবে বুঝতেও এই পরিচয় প্রয়োজন।

প্রচ্ছদ চিত্র

নিচে : চিরায়ত আলোক বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যবহৃত পুরানো দিনের যন্ত্র।

উপরে : আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর ভরের প্রভাবে স্থান-কাল যেভাবে বাঁকে তার আভাস।

চিরায়ত ও বৈপ্লবিক বিজ্ঞান

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

উৎসর্গ

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের (সিএমইএস) ব্যাপক
কর্মযজ্ঞে যারা সর্বক্ষণ নিজেদেরকে
নিয়োজিত রেখেছে তাদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

বিজ্ঞান কী, এই প্রাচীন অথচ চিরনূতন প্রশ্নটি নিয়েই শুরু হয়েছে 'সবার জন্য সর্ব শেষ বিজ্ঞান' সিরিজের এই প্রথম বইটি। বিজ্ঞানকে নানা ভাবে দেখা যায়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো বিজ্ঞান কেমন করে কাজ করে সেই পদ্ধতিটিকে বুঝা। হাজার বছরের এলোমেলো অগ্রগতির পর আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মলগ্নে যখন বিজ্ঞানের এ পদ্ধতিটি পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে তার পরপরই গড়ে উঠতে পেরেছিল গতিবিদ্যায় বিজ্ঞানের একটি ভিত্তিভূমি; প্রধানত গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখের কল্যাণে। তারও পরে এসেছে ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল প্রমুখের সুবাদে সুসংবদ্ধ বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব। এসব নিয়ে আধুনিক ভৌত বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত কাঠামো খাড়া হয়ে গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে। একে আমরা চিরায়ত বিজ্ঞান বলে জানি– কারণ এর মূল আবেদন কখনো বাসি হয়ে যায়নি, আজও নয়। সাম্প্রতিক, এমনকি সর্বশেষ বিজ্ঞানকে বুঝতে এই চি ায়ত বিজ্ঞানের পথে না হেঁটে উপায় নেই। বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও একজন আগ্রহী পাঠক যাতে বিজ্ঞানের এই সৌন্দর্যকে কিছুটা হলেও আস্বাদন করে আনন্দ পেতে পারেন সেটি এই বইয়ের এবং সিরিজের সব ক'টি বইয়ের লক্ষ্য। চিরায়ত বিজ্ঞানের সাফল্য সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞানের উপর সেই প্রচণ্ড আস্থা নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা যার প্রতীক হয়ে রয়েছে– এর মাধ্যমে বিশ্বকে একটি চিরতরে দম দেয়া ঘড়ির নানা চাকার নিঁখুত নিয়মে চলার মত করে দেখতে পারা; গণিতের আঁক কষে এর সকল ভবিষ্যৎ নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করতে পারা। অসংখ্য পরীক্ষায় দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের বিশাল পটভূমিতে পর্যন্ত কোথাও এর তেমন কোন ব্যতিক্রম দীর্ঘকাল চোখে পড়েনি। এর মধ্যে কিছুটা প্রবেশ না করলে আমরা এর চমৎকারিত্বটা বুঝতে পারবোনা।

একই কথা প্রযোজ্য সেই চিরায়ত বিজ্ঞানে বিশেষ কিছু সংকট আবিষ্কৃত হবার ফলশ্রুতিতে পদার্থবিদ্যায় যেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলো তার ক্ষেত্রেও। এ পরিবর্তন বিজ্ঞানের মৌলিক কিছু ধারণায়, নিয়মে এবং এর দার্শনিক ভিত্তিতে একেবারে অভিনব সব বিষয় নিয়ে এলো। এর মধ্যে আপেক্ষিক তত্ত্ব মাহাবিশ্বকে, এমন কি স্থান ও কালের প্রকৃতিকে, নূতন চোখে দেখতে বাধ্য করলো। কোয়ান্টাম তত্ত্ব ঐ নিখুঁত ঘড়ির নিয়মে চলা যে বিজ্ঞান তা ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর জগতে অচল বলে প্রমাণ করে দিল। এর জায়গায় এটি প্রতিষ্ঠিত করলো গাণিতিক সম্ভাবনার ও এক পর্যায়ে কিছুটা অবধারিত অনিশ্চয়তাকে মেনে নেয়ার নূতন বাস্তবতা; যা কিন্তু একই ভাবে ফলপ্রসূ এবং অনেক বেশি জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে পারছে। বিষয়গুলো জটিল, কিন্তু আগ্রহী সাধারণ পাঠক তারও রস আস্বাদন করতে পারবেন, যদি খুব হালকাভাবে হলেও এর সামান্য খুটিনাটিতে ঢুকতে রাজি থাকেন। এই বইটির সেটিই চেষ্টা। চিরায়ত ও বৈপ্লবিক বিজ্ঞানের এসব মৌলিক ভিত্তির উপর শুধু পদার্থবিদ্যা নয় আজকের রসায়ন, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, এমনকি জীববিদ্যারও অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত। সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞানের যাত্রায় তাই এটি হবে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। এই সিরিজের বইগুলোতে আমরা আজকের বিজ্ঞানের বিচিত্র যেসব দিক আধুনিক জীবন ও আধুনিক মননশীলতাকে সম্ভব করে তুলতে কাজ করছে, তার খানিকটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের আশা করবো।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

বিজ্ঞান কী? ০৭

গতির নিয়ম ১১

নিত্যতার নিয়ম ও প্রতিসাম্য ১৬

মহাকর্ষের নিয়ম ২৩

তাপ ও গতি ২৯

আলোক তরঙ্গ, বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ ৩৪

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব ৪৯

কোয়ান্টাম তত্ত্ব ৫৯

বিজ্ঞান কী?

বিজ্ঞানের নানা পরিচয়

বিজ্ঞান কী– এ প্রশ্ন নিয়ে আমাদের সবার একটি নিজস্ব ধারণা আছে। বিভিন্ন ধারণা থাকার একটি কারণ হলো বিজ্ঞানকে নানা দিক থেকে দেখা সম্ভব। সোজা কথায় আমরা সবাই বুঝি যে যা কিছু 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' মেনে করা হয় তাই বিজ্ঞান। একই সঙ্গে আবার বিজ্ঞানকে বহু দিনের সঞ্চিত জ্ঞান, বিশেষ ধরনের 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতার' প্রকাশ, দীর্ঘ দিনে গড়ে ওঠা বিশেষ রকম 'প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম নীতির' মধ্যে করা কাজ,বাস্তবে কাজে লাগে এরকম যন্ত্রপাতি বা কৌশল উদ্ভাবনের জ্ঞান– এমনি সব নানা ভাবেও দেখা যায়। এর সবই বিজ্ঞানের পরিচয় হিসেবে গ্রহণযোগ্য। হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে আমরা মানুষরাই এরকম বিশেষ পদ্ধতি, বিশেষ মানসিকতা, বিশেষ জ্ঞান, যন্ত্র তৈরির বিশেষ কৌশল, শেষ অবধি বিশেষ প্রতিষ্ঠানিক আয়োজন গড়ে তুলেছি– যাকে এখন আমরা বিজ্ঞান বলি। বহু হাজার বছর ধরে যারা এগুলো প্রাচীন কালে করেছে এখন দেখা হলে আমরা তাদেরকে বিজ্ঞানী হিসেবে চিনবোনা– কারণ তাদের কাজকর্ম ভাবসাব ছিলো অন্য রকমের। তারা কেউ ছিল যাদুকর, কেউ কারিগর, কেউ হাতুড়ে চিকিৎসক– ওষুধের সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রও যাদের চলতো, কেউ পুরোহিত, আবার কেউ ভাবুক গোছের মানুষ। কিন্তু তাদের কাজের কোন কোন অংশ এমন ছিল যার মধ্যে আমরা বিজ্ঞানের গন্ধ পেতে পারি, এবং এসব অংশগুলোই বহুকালের ভুল-শুদ্ধ চর্চার মধ্য দিয়ে আজকের বিজ্ঞানের পর্যায়ে চলে এসেছে।

বিজ্ঞানের পদ্ধতি

বিজ্ঞানকে চিনতে আমাদের বিশেষ ভাবে নজর দিতে হয় তার পদ্ধতির দিকে। এ পদ্ধতি মানুষের সৃষ্টি– যুগে যুগে বিজ্ঞানের চর্চার মাধ্যমেই এটি রূপ পেয়েছে। এই বিশেষ চর্চা নিজের জন্যই নিজে কিছু পদ্ধতির সীমানা টেনে দিয়েছে। যেমন এটি কোন কর্তৃপক্ষের কথার বা মতের উপর নির্ভর করেনা, বরং মনোযোগী পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে– যেমন করেছে সেই ব্যাবিলনীয় অথবা মিশরীয়

পণ্ডিতগণ বা তারো আগের প্রাগৈতিহাসিক 'বিজ্ঞানীদের' পর্যবেক্ষণের উপর। যা বারবার একই ভাবে ঘটছে তা আবার ঘটবে, এবং তার পেছনে কোন একটি নিয়ম কাজ করছে এরকম ধারণাটি তাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করেছে। তারপরও কিন্তু বিজ্ঞানী তাঁর মন খোলা রাখেন– যদি কখনো এমনি পুনরাবৃত্তি ঘটার ক্ষেত্রে একটি বারও ব্যতিক্রম হয় এবং এই ব্যতিক্রমের কোন সঙ্গত কারণ না পাওয়া যায়, তা হলে ঐ নিয়ম তাঁর আর মানার উপায় থাকেনা। বিজ্ঞান সব সময় পুনর্বিবেচনার পথ খোলা রাখে, এতে অমোঘ শেষ কথা বলতে কিছু নেই।

গ্রীক সভ্যতার যুগে সেখানকার বিজ্ঞানী-দার্শনিকরা পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আরো একটি জরচরী বিষয়কে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হলো লজিক, যা কিনা যৌক্তিক ভাবে একটি জ্ঞান থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এ জন্য তাঁরা গাণিতিক যুক্তিকেও চমৎকারভাবে ব্যবহার করছিলেন। পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্যগুলোকে এবং সেগুলোর নিয়মিত পুনরাবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য এক একটা থিওরি বা তত্ত্ব খাড়া করার প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ পর্যায়ে নিয়ে যান গ্রীক দার্শনিকরা। বিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যে যৌক্তিক কল্পনা, এমনকি বিমূর্ত ধারণারও চমৎকার জায়গা করে দিয়েছিলেন তাঁরা, যা ছাড়া আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের কথা ভাবা যায় না। এভাবেই সেই দু'হাজারেরও বেশি বছর আগে তাঁরা সব বস্তুকে মনে করেছিলেন কিছু মৌলিক বস্তুর সমন্বয়ে গড়া, আবার তাঁদের কেউ কেউ মনে করেছিলেন সব বস্তু ক্ষুদ্র এটমে গড়া (গ্রীক ভাষায় এটম শব্দটির মানে অবিভাজ্য)। আবার দৈনন্দিন বা মাস বা বছর জুড়ে চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারার চলাচলের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁরা খাড়া করেছিলেন মহাবিশ্বের কিছু জটিল কিন্তু খুবই বিস্তারিত চিত্র। এই চিত্রের ভিত্তিতে হিসেব করলে পর্যবেক্ষণে পাওয়া সব তথ্য মিলেও যেত, এমন কি পরবর্তীতে কী কী ঘটবে জটিলতা সত্ত্বেও তার সঠিক পূর্বাভাস দেয়া যেত। এখন আমরা জানি ফলাফলের সঠিকতা সত্ত্বেও এসব ধারণার অনেকখানিই ভুল ছিল। কিন্তু তাতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটি দাঁড় করানোর মধ্যে তাঁদের তেমন ভুল ছিলনা; বরং এর মাধ্যমে অনেক ফলাফল তাঁরা খুব নির্ভুলভাবে হিসেব করতে পেরেছিলেন।

অনেক কিছু করেও গ্রীক দার্শনিকরা বিজ্ঞানের পদ্ধতির একটি বড় দিককে বেশি আমলে নেননি, আর এটিই তাঁদের অনেক ভুলের জন্য দায়ী। এই দিকটি হলো সুনিয়ন্ত্রিত এক্সপেরিমেন্ট। পর্যক্ষেণের ভিত্তিতে যে তত্ত্ব খাড়া করা হলো সেটি যাতে নেহাৎ মনগড়া যে কোন কিছু না হয়, বাস্তবতার কষ্টি পাথরে তাকে যেন যাচাই করে নেয়া যায়, সে জন্যই এক্সপেরিমেন্টের দরকার। যাচাইটা ঠিক মতো করা যাবে যদি এরকম পরীক্ষায় অনেকগুলো দিক বা নিয়ামক একই সঙ্গে অজানা না থাকে। পরীক্ষায় একটি মাত্র প্রাপ্তব্য জিনিস রেখে বাকি সব নিয়ামককে যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তা হলেই ঐ এক্সপেরিমেন্ট বলে দিতে পারবে কত ধানে কত চাল– অর্থাৎ তত্ত্বটি সঠিক না সঠিক নয়। যা এর আগে পর্যন্ত ছিল বিজ্ঞানীর নেহাৎ অনুমান মাত্র, সফল এবং বার বার পুনরাবৃত্ত পরীক্ষার ফলে তা একটি সর্বজনমান্য তত্ত্বে পরিণত হতে পারে। অনুমানে সরাসরি যা পাচ্ছি, পরীক্ষায় কিন্তু ঠিক তাকেই যে যাচাই করা যাবে এমন কথা নেই। বরং অনুমান নির্ভর তত্ত্বটি যুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে বা গাণিতিক প্রক্রিয়ার ধাপগুলো অনুসরণ করে যে ফলাফল বা সিদ্ধান্ত দেয় সেই সিদ্ধান্তগুলোকেই পরীক্ষার সম্মূখীন করা হয়। সেগুলো টিকলে তত্ত্বটিও টিকবে।

চিরায়ত গতিবিদ্যা

যদিও প্রকৃতির সর্বত্র নানা ক্ষেত্রেই নানা ঘটনা নিয়ে গোড়া থেকে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ভেবেছেন, এমনকি তত্ত্বও দিয়েছেন, তাঁদের সব চেয়ে বেশি মনোযোগ ছিল মহাকাশের দিকে। সেখানে গ্রহ-তারার গতিপ্রকৃতির দিকে, আবার পৃথিবীতেও নানা জিনিসের গতি, বল, শক্তি ইত্যাদির মধ্যে নিয়ম খুঁজে পেতে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। এসবকে এখন আমরা গতিবিদ্যা বা আরো সাধারণভাবে পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত বলে মনে করি। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রগুলোতে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এসে বিজ্ঞান একটি চমৎকার অবস্থানে চলে এসেছিল। বড় অগ্রগতির একটি কারণ এসেছে কপারনিকাস আর কেপলারের সঠিক বিশ্বছবি দেবার পরিপ্রেক্ষিতে (সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর ও গ্রহগুলোর পরিক্রমণ ও আবর্তন; গ্রীকদের ও পরবর্তী অনেকের ধারণা মত পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বাকি বিশ্বের জটিল পরিক্রমণ নয়)। এটি আরো বলীয়ান হয়েছে গ্যালিলিও ও নিউটনের

গতি সম্পর্কীয় খুবই সূক্ষ্ম ও গাণিতিক নিয়মগুলো আবিষ্কারের ফলে। সেই সঙ্গে নিউটনের বিশ্বজনীন মহাকর্ষ তত্ত্ব এসব নিয়মকে আমাদের ঘরোয়া পরিবেশে যেমন, তেমনি পুরো বিশ্বচরাচর ব্যাপী সর্বত্র একই ভাবে প্রয়োগযোগ্য করে বিজ্ঞানকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছিল। এই সময়টিকে বলা যায় আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মকাল। তখন থেকে 'বিজ্ঞান' আজকের অর্থে পুরোপুরি বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের পদ্ধতির সবগুলো দিককে, বিশেষ করে পরীক্ষার মাধ্যমে তত্ত্বকে প্রমাণের অপরিহার্যতাকে গুরচত্ব দিয়ে এই যে অগ্রযাত্রা শুরচ হলো, আমাদের আজকের পরিচিত বিজ্ঞান তারই ফলশ্রচতি।

নিউটন পদার্থবিদ্যার মৌলিক গতিবিদ্যাকে, যেভাবে নিঁখুত গাণিতিক রূপ দিয়ে গিয়েছেন মোটা দাগে সেটি আজ অবধি টিকে রয়েছে এবং এটিই বিজ্ঞানকে ক্রমাগত উন্নতির পথে নিয়ে যেতে একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। তখনকার এবং পরবর্তী সময়ের নিরবিচ্ছিন্নভাবে অত্যন্ত সফল এই বিজ্ঞানকে আমরা 'চিরায়ত' (ক্লাসিকাল) এই বিশেষণে বিশেষায়িত করে থাকি। নিউটনের ৩০০ বছর পরে গত শতাব্দীতে এসে অবশ্য এর মধ্যে কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, আজকের বিজ্ঞানের জন্য যেগুলোর ভূমিকা অপরিহার্য। এই বইয়ে আমরা প্রথম দিকে সেই চিরায়ত গতিবিদ্যার কিছু বিষয় আলোচনা করবো, এবং শেষের দিকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলোর কথায় আসবো। কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলোর কারণে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির ও সক্ষমতার যথেষ্ট পরিবর্তন এলেও ঐ চিরায়ত বিজ্ঞানের কথাগুলো তাতে মোটেও অনাবশ্যক হয়ে পড়েনি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তার উপরেই এখনো নির্ভর করি এবং তার মাধ্যমেই আধুনিকতম বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোর দিকে যেতে পারি।

গতির নিয়ম

গতির আপেক্ষিকতা

গতিকে বিবেচনায় আনতে হলে গতির আপেক্ষিকতাটি বুঝতে হবে। কোন কিছু স্থির আছে, নাকি কোন রকম ভাবে গতিশীল আছে তা বুঝাটা নির্ভর করে কার পরিপ্রেক্ষিতে এটা দেখা হচ্ছে তার উপর। উড়ন্ত বিমানে বিমানবালা যখন খাবার নিয়ে ধীর পদক্ষেপে যাত্রীদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যান তখন বিমানের পরিপ্রেক্ষিতেই যাত্রীরা তাঁকে দেখেন। নিচে মাটিতে থাকা যদি কেউ যদি দূরবীন দিয়ে বিমানবালাকে দেখতে পেতেন তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে বিমানবালা কিন্তু বিমানের সঙ্গে ঘন্টায় ৫০০ কিলোমিটার বেগে ছুটে যাচ্ছেন। কাজেই গতির হিসেবটি আপেক্ষিক। যেই কাঠামোতে আমি রয়েছি সেটি যতক্ষণ একই অভিমুখে সমগতিতে চলছে ততক্ষণ এই কাঠামোর বাইরে কিছু না দেখে আমি বলতে পারবোনা আমাকে নিয়ে সেটি আদৌ গতিশীল কিনা। ষ্টিমার যদি মসৃণভাবে একই দিকে সমগতিতে চলে তা হলে এর বদ্ধ কেবিনের মধ্যে থেকে আমরা বুঝতেই পারবনা ষ্টিমার চলছে নাকি চলছেনা। এরকম গতি একটি বস্তুর স্বাভাবিক সার্বক্ষণিক অবস্থা, যেমন স্থির থাকা অন্য স্বাভাবিক অবস্থা। শুধু ভিন্ন কোন কাঠামোর আপেক্ষিকেই সেটি বুঝা যাবে। তবে যদি গতিবেগ বাড়ে বা কমে অর্থাৎ এর যদি কোন ত্বরণ ঘটে (তা ঋণাত্মক ত্বরণও হতে পারে, বেগ কমলে) তাহলে ভিন্ন কথা, তখন পরিবর্তনটি আমরা বাইরে না তাকিয়েই বুঝতে পারবো। গতির দিক পরিবর্তনও এক ধরনের ত্বরণ, সেক্ষেত্রেও বাইরে না তাকিয়েই বুঝতে পারবো।

গতির প্রথম নিয়ম

সাধারণ বুদ্ধিতে আমাদের মনে হতে পারে একই দিকে সমগতিতে চলার জন্যও গতিমান বস্তুটির পেছনে সব সময় বল প্রয়োগ করে যেতে হয়, কারণ তা না করলে কিছুক্ষণ পর সেটি থেমে যেতে দেখি। গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টোটলের মত বড় বিজ্ঞানীও কিন্তু এ ভুল করেছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে হাজার বছরের

বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা এতে কোন প্রশ্ন তোলেননি। আসলে ব্যাপারটি হলো সমবেগে সরল রেখায় চলার জন্য বস্তুটির কোন বল প্রয়োজন হয়নি। বরং থেমে যাওয়াটাই ঘর্ষণের বলপ্রয়োগে ঘটেছে– যেমন রাস্তার বা বাতাসের ঘর্ষণের বল। সেই বলগুলো না থাকলে বস্তুটি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সেই একই সমগতিতে সোজা চলতে থাকতো। ঘর্ষণবিহীন স্থানে পরীক্ষা করলেই এটি আমরা দেখতে পাব। কাজেই কোন বল প্রযুক্ত না হলে যে কোন বস্তু তার একই সমগতিতে একই দিকে চিরকাল চলতেই থাকবে (স্থির থাকাটিও এরকম একটি অবস্থা, বলতে পারি শূন্য গতিতে চলছে)। এটি নিউটনের গতির প্রথম নিয়ম বলে পরিচিত। একে জড়তার নিয়মও বলে, কারণ এটি যা বলছে তা হলো কোন বল প্রয়োগ ব্যতীত গতিতে জড়তা থাকে, অর্থাৎ এতে কোন পরিবর্তন আসেনা।

গতির দ্বিতীয় নিয়ম

গতির দ্বিতীয় নিয়মে বল প্রয়োগের প্রশ্নটি আসে। বল প্রয়োগ করলে বস্তুটিতে ত্বরণ ঘটে (গতি বাড়ে বা কমে, বা দিক পরিবর্তন হয়)। বেগ কী হারে বাড়ে বা কমে সেটিই ত্বরণের পরিমাপ। একটি নির্দিষ্ট বলের প্রয়োগে ত্বরণ কতখানি হবে তা নির্ভর করবে বস্তুটির ভরের উপর। ভর বেশি হলে ত্বরণ কম হবে, ভর কম হলে ত্বরণ বেশি হবে। গতির এই দ্বিতীর নিয়মে বল, ভর, ত্বরণ এই তিনটি জিনিস সম্পর্কেই আমরা ধারণা তাদের পরস্পর সম্পর্কের আকারে। গতির দ্বিতীয় নিয়ম বলে ত্বরণটি প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক, আর এক্ষেত্রে সমানুপাতের ধ্রুবক হলো বস্তুটির ভর। গতির দ্বিতীয় নিয়মকে তাই এভাবে লেখা যায়: বল = ভর × ত্বরণ

ভর আমরা কিলোগ্রামে মাপি। বেগ মাপি সেকেন্ডে কত মিটার যায় সেই হিসেবে, অর্থাৎ মিটার /সেকেন্ড হিসাবে। আর ত্বরণ মাপি সেকেন্ডে কোন নির্দিষ্ট মিটার বেগ প্রতি সেকেন্ড পর সেকেণ্ডে কত মিটার বেগে পরিণত হয় সেই হিসাবে, অর্থাৎ মিটার/সেকেন্ড/সেকেন্ড। কোন বস্তুতে নির্দিষ্ট কোন ত্বরণ সৃষ্টি করতে হলে এই দ্বিতীয় নিয়মই বলে দেয় বস্তুটির ভর অনুযায়ী কত বল প্রয়োগ করতে হবে। ভর আর ত্বরণের একককে গুণ করলে উপরের সমীকরণ অনুযায়ী বলের এককটিও পেয়ে যাই, যাকে বলা হয় নিউটন।

গতির তৃতীয় নিয়ম

নিউটন গতির আরো একটি নিয়ম আবিষ্কার করেছেন– গতির তৃতীয় নিয়ম। এটি বলে আমি যদি কোন কিছুতে বল প্রয়োগ করি, তা হলে এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমি নিজেও ঠিক উলটো দিকে বলপ্রয়োগের লক্ষ্যবস্তু হবো। এই প্রতিক্রিয়াটি কতখানি হবে তাও এই নিয়ম বলে দেয়। একটি নৌকাতে বসে যদি আমি অন্য একটি নৌকাকে ঠেলা দিয়ে চলমান করি তা হলে আমার নৌকাও উল্টো দিকে চলতে আরম্ভ করবে। তবে কোনটি কী বেগে চলবে তা নির্ভর করবে কোনটির ভর কত তার উপর। যে নৌকাকে ঠেলেছি যাত্রী সহ তার ভর যদি আমার নৌকার দ্বিগুণ হয়, আমার নৌকা গতি বেগ পাবে সেটির অর্ধেক। গতির এই তৃতীয় নিয়মটি সাধারণ ভাবে বলে প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয়েই নির্ভর করে যার যার ক্ষেত্রে গতিশীল বস্তুর ভর ও বেগের উপর। এর একটি উদাহরণ উপরে দেখেছি, তবে এর বিস্তারিত আমরা পরের অধ্যায়ে দেখবো।

পতনশীল বস্তুর ত্বরণ

নিউটনের আগে গ্যালিলিও আরো একটি পুরানো ভুল শুধরে দিয়েছিলেন, যে ভুল অনেক সময় আমরাও করি। উপরে স্থির অবস্থা থেকে নিচে পড়তে দিলে যে কোন বস্তু নির্দিষ্ট ত্বরণে ক্রমাগত নিচের দিকে তার গতিবেগ বাড়াতে থাকে। পৃথিবীর উপর অবাধে পতনশীল বস্তুতে এই ত্বরণকে g এই চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। প্রাচীন কাল থেকে মনে করে আসা হচ্ছিল যে দুটি বস্তু এক সঙ্গে একই উচ্চতা থেকে ফেল্‌লে ভারি বস্তুটি আগে মাটিতে পড়বে। গ্যালিলিও গাণিতিক ভাবে দেখালেন কথাটি ঠিক নয়, সব ভরের বস্তুই এক সঙ্গে মাটিতে পড়বে, g ত্বরণে গতিবেগ বাড়াতে বাড়াতে একই গতিতে। এরপর তিনি পরীক্ষার মাধ্যমেও বিষয়টি প্রমাণ করেন। এও তিনি বুঝতে পারেন যে আপাত দৃষ্টিতে ভারি বস্তুকে আগে পড়তে দেখা গেলে বুঝতে হবে তার আকৃতির জন্য হালকা বস্তুটি বাতাসের দ্বারা বেশি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলেই এমনটি হচ্ছে।

ঘূর্ণন গতি

বল প্রযুক্ত না হলে সমবেগে সরল রেখায় যাওয়া বস্তু গতির প্রথম নিয়ম অনুযায়ী সর্বদা একই বেগে চলতে থাকে; কিন্তু বক্র রেখায় চলা বস্তুর ক্ষেত্রে একই বেগে চল্‌লেও দিক পরিবর্তন জনিত ত্বরণে বলের ব্যাপারটি যে এসে পড়ে তা আমরা দেখেছি। যেমন ধরা যাক কোন বস্তু বৃত্তাকার পথে পাক খাচ্ছে একই বেগে। এ ক্ষেত্রে ঐ বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে বস্তুটির উপর একটি বলের প্রয়োজন হবে, নইলে এমন ভাবে বস্তুটি ঘুরতে পারবেনা। দড়ির আগায় বেঁধে একটি ভারি বস্তুকে হাতে ঘুরাতে থাকলে আমরা অনুভব করাবো যে হাত দিয়ে বস্তুটিকে আমাকে টেনে রাখতে হচ্ছে। এটিই সেই বল।একে বলা হয় কেন্দ্রমুখি বল।এর পরিমাণ:

$$\text{কেন্দ্রমুখি বল} = \frac{\text{ভর} \times \text{বেগ}^২}{\text{ব্যাসার্দ্ধ}},$$

যেখানে ব্যাসার্দ্ধটি হলো ঐ বৃত্তটির ব্যাসার্দ্ধ। এমন একটি বল থাকার মানে হলো কেন্দ্রের দিকে বস্তুটির একটি ত্বরণও রয়েছে যা এক্ষেত্রে ঘূর্ণনে পরিণত হচ্ছে।

গতির তৃতীয় নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রমুখি বলের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কেন্দ্র থেকে বাইরে দিকে একটি সমান কেন্দ্রবিমুখি বল থাকবে কেন্দ্রবিমুখি একটি ত্বরণ। আমাদের ঐ দড়ির আগায় বেঁধে ঘুরানো বস্তুর উদাহরণে যদি কখনো দড়িটি কেটে দেয়া হয় বা ছেড়ে দেয়া হয় তা হলে এই কেন্দ্রবিমুখি বলের কারণেই এটি সোজা সামনের দিকে ছুটে যাবো। ঘূর্ণনে কেন্দ্রমুখি বল আর কেন্দ্রবিমুখি বল পরস্পর কাটাকুটি হয়ে যাবে না তো? না তা হবেনা। মনে রাখতে হবে যে কোন ক্রিয়া যার উপর কাজ করে, প্রতিক্রিয়া কিন্তু কাজ করে অন্য কিছুর উপর। যেমন নৌকায় বসে অন্য নৌকা ঠেলা দেয়ার উদাহরণে ক্রিয়াটি হয়েছে অন্য নৌকার উপর, প্রতিক্রিয়া হয়েছে আমার নৌকার উপর। দড়িতে বেঁধে হাতে বস্তু ঘুরানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রমুখি বলটি (ক্রিয়া) কাজ করে বস্তুটির উপর হাতের টানে, আর কেন্দ্রবিমুখি বলটি (প্রতিক্রিয়া) কাজ করে হাতের উপর বস্তুটির টানে। হাত থেকে অবমুক্ত হলে ঐ বলেই সেটি ছিটকে ছুটে যায়। কেন্দ্রবিমুখি কথাটির ইংরাজী প্রতিশব্দ

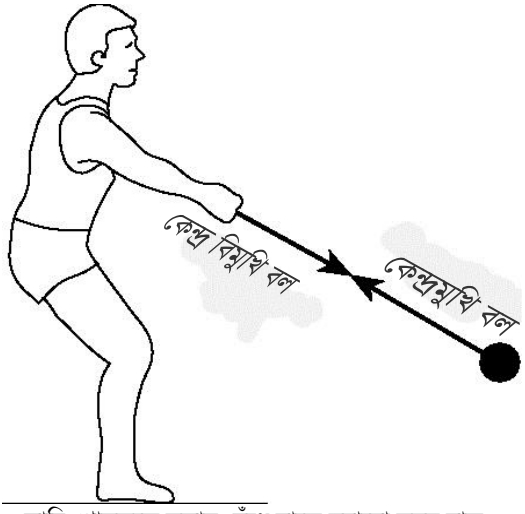

ভারি গোলককে সূতায় বেঁধে হাতে ঘুরানো সময় হাত কেন্দ্রমুখি বলে একে টেনে রাখে, আর গোলকটি কেন্দ্র-বিমুখি বলে বাইরের দিকে যেতে চায়।

সেন্ট্রিফুগ্যাল। এটি মনে রাখা ভাল কারণ ঠিক এই জিনিসটিই সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। এখানে টেষ্ট টিউবে বিভিন্ন ঘনত্বের তরলের মিশ্রণ নিয়ে টেষ্টটিউবের তলাটিকে বাইরের দিকে রেখে খুব জোরে বৃত্তাকারে ঘুরানো হয়। কেন্দ্রবিমুখি বলে ছিটকে বাইরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় বিভিন্ন ঘনত্বের (ভরের) তরলগুলো পৃথক হয়ে গিয়ে টেষ্টটিউবের বিভিন্ন অংশে জমা হতে পারে - এভাবে একটি মিশ্রণকে তার নানা উপাদানে বিভক্ত করা যায়, যেমন রক্তকোষকে রক্তের জলীয় অংশ থেকে।

নিত্যতার নিয়ম ও প্রতিসাম্য

ভরবেগের নিত্যতা

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে উদাহরণটি আমরা গত অধ্যায়ে দিয়েছি সেটি আবার স্মরণ করি। সেখানে দেখেছি নৌকায় বসে আমি অন্য যে নৌকাকে ঠেলে দিয়েছি যাত্রীসহ তার ভর যদি আমাকে নিয়ে আমার নৌকার ভরের দ্বিগুণ হয় তা হলে ঐ নৌকার বেগ আমার নৌকার অর্ধেক হবে। এই ফলাফলটি আমরা সহজে পেতে পারি ভরবেগের ধারণাটি এনে এবং সব রকম আন্ত-ক্রিয়ায় এই ভরবেগ একই সমান থেকে যায়– এই নিয়মটি যদি লক্ষ্য করি। এটিই ভরবেগের নিত্যতা। ভরবেগ (মোমেন্টাম) হলো ভর এবং বেগের গুণফল। ভর যতই হোক বেগ শূন্য হলে গুণফল শূন্য বলে ভরবেগ ও শূন্য হবে। অন্য নৌকায় ঠেলা দেয়ার আগের মুহূর্তে স্থির দুটি নৌকার ক্ষেত্রেই ভরবেগ শূন্য। ভরবেগ দুটি যোগ করে দুই নৌকা মিলে পুরো সিষ্টেমের ভরবেগ যদি হিসেব করি তাহলে দুটি শূন্য ভরবেগের যোগফলও হবে শূন্য। এবার ঠেলা দেবার পর আবার যদি দুই নৌকার মোট ভরবেগ হিসেব করি এখনো ভরবেগের নিত্যতা অনুযায়ী তা শূন্য হতে হবে। ঠেলা দেয়ার পর নৌকা দুটির একটির ভরবেগ যদি অন্যটির সমান ও বিপরীত হয় যাতে উভয়ে কাটাকুটি হয়ে যাবে, শুধু সেক্ষেত্রেই যোগফল এরকম শূন্য হতে পারবে। দ্বিতীয়টির ভর যখন প্রথমটির দ্বিগুণ, ভরের সঙ্গে বেগের গুণফল উভয় ক্ষেত্রে সমান হতে হলে দ্বিতীয়টির বেগকে হতে হবে অর্ধেক; বাস্তবে যা আমরা পাই। এভাবেই সঠিক ফল পেতে ভরবেগের নিত্যতাকে আমরা ব্যবহার করছি। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল যে বস্তুর ভরকেও চিরায়ত বিজ্ঞানে একটি নিত্য জিনিস মনে করা হয়– কোন বিক্রিয়াতে মোট ভরের কোন পরিবর্তন হয় না।

এভাবে সব রকম সিষ্টেমের মধ্যে সব রকম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভরবেগের নিত্যতাটি অবশ্যই মান্য হতে হবে। এরকম কয়েক রকমের নিত্যতার নিয়ম রয়েছে যার বিজ্ঞানের এক একটি অপরিহার্য নিয়ম– কখনোই এগুলোর ব্যতিক্রম হতে পারেনা। এই নিত্যতার নিয়মগুলো অনেক কিছুর পেছনেই একেবারে মৌলিক একরকম অনিবার্যতা হিসেবে কাজ করে– তাই খুব গুরচত্বপূর্ণ।

গতির ফলাফলের প্রকাশ ঘটার ক্ষেত্রে বেগের ভূমিকা গুরচত্বপূর্ণ হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কিন্তু ভরবেগের গুরচত্ব তার চেয়েও বেশি। যেমন একটি ছোট মোটর গাড়ি মহাসড়কে বিপরীত দিক থেকে তার সমান ভরের আর একটি গাড়ির মুখোমুখি এগিয়ে গেলে সংঘর্ষে প্রথমটির যে ক্ষতির আশঙ্কা, সে আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায় যদি দ্বিতীয় গাড়িটির ভর তার চেয়ে ১০ গুণ বেশি হয়, আগেরটির মত একই বেগে চলা সত্ত্বেও। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গাড়িটির ভরবেগ ১০ গুণ বেশি হওয়াটাই সংঘর্ষের ফলাফলকে ভয়াবহ করে তোলে, বেগের কারণে নয়।

কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা

সরলরৈখিক গতির ক্ষেত্রে যেমন ভরবেগ গুরচত্বপূর্ণ, তেমনি ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রেও একটি গুরচত্বপূর্ণ পরিমাপ হলো কৌণিক ভরবেগ। সেই ঘূর্ণন নিজের অক্ষের উপর লাটিমের মত বন বন্ করে ঘোরাও হতে পারে। কৌণিক ভরবেগের মান পাওয়া যাবে নিচের সংজ্ঞা থেকে:

$$\text{কৌণিক ভরবেগ} = \text{ভর} \times \text{বেগ} \times \text{ব্যাসার্দ্ধ}$$

এখানে ব্যাসার্দ্ধটি হলো ঘূর্ণন বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ। অবশ্য সরল রেখার গতির ক্ষেত্রে যেমন বেগের বা ভরবেগের মানের সঙ্গে সঙ্গে একটি দিকও থাকে, কৌণিক ভরবেগেরও তেমনি একটি দিক রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দিকটি নির্ণিত হয় ঘূর্ণনের অক্ষের বরাবর এটি ডানহাতি ভাবে ঘুরছে না বাঁহাতি ভাবে ঘুরছে সে অনুযায়ী অক্ষের দিকে এই অভিমুখে অথবা তার বিপরীত অভিমুখে।

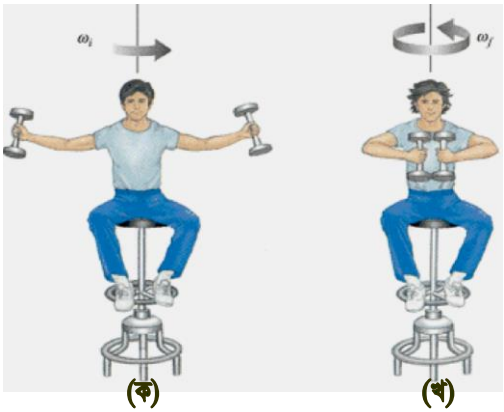

(ক) ঘুরন্ত টুলে বসে দুহাতে ওজন প্রসারিত।

(খ) ওজন সহ হাত গুটিয়ে নিলে ঘূর্ণন গতি বেড়ে যাচ্ছে।

একটি ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে বা এরকম নানা ঘূর্ণন গতির আন্তক্রিয়ার ক্ষেত্রে আগে বা পরের কৌণিক ভরবেগ সব সময় একই থাকতে বাধ্য। এটি কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা। এই নিত্যতা থেকেও আমরা অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা পাই।

ধরা যাক আপনি অবাধে ঘর্ষণহীন ভাবে ঘুরন্ত এমন একটি চেয়ারে বসে আছেন, প্রসারিত দুই হাতে দুটি ভারী বস্তু। হঠাৎ আপনার প্রসারিত দুই হাত ভারসহ গুটিয়ে নিয়ে আপনার বুকের কাছাকাছি নিয়ে আসলেন। কী ঘটবে? আপনার ঘোরার গতি এর ফলে বেড়ে যাবে। কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা দিয়ে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায়। হাত যখন গুটিয়ে নিলেন তখন ভর, বেগ, ও ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে পরিবর্তন ঘটলো একমাত্র যেটির তা হলো ঘূর্ণনের ব্যাসার্দ্ধটি। একে আপনি ছোট করে ফেল্‌লেন। তাতে ভর × বেগ × ব্যাসার্দ্ধ অর্থাৎ কৌণিক ভরবেগ কমে যাওয়ার কথা; অথচ এর নিত্যতার নিয়মে তা সম্ভব নয়। তাই ঐ গুণফলকে সমান রাখার জন্য অন্য দুটি উপাদানের কোনটিকে বা দুটিকেই বাড়তে হবে। ভর একটি নিত্য জিনিস বলে তা বাড়ার সুযোগ নেই। তাই একমাত্র বাড়তে পারে বেগ, এবং তাই বেগ বাড়ে।

আরো জটিল ক্ষেত্রে ব্যাপারটি দেখতে পারেন। মনে করেন আগের ঐ চেয়ারটি এখন স্থির আছে আপনি ঐ চেয়ারটিতে বসে আছেন বাইসাইকেলের একটি চাকাকে তার ঘূর্ণন অক্ষটি ধরে মাথার উপর ছাতার মত ধরে রেখেছেন। শুরচতে আপনার চেয়ারটি ঘুরছেনা, সাইকেলের ঐ চাকাটিও ঘুরছেনা। এবার আপনি হাত দিয়ে চাকাটিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এখন আপনার চেয়ারের কী হবে? এটি চাকার উল্টো দিকে ঘুরতে আরম্ভ করবে। কৌণিক ভরাবগের নিত্যতার নিয়ম দিয়ে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যাক। শুরচতে চেয়ার, চাকা সব নিয়ে পুরো সিষ্টেমটির মোট কৌণিক ভরবেগ ছিল শূন্য, কারণ সব কিছুর বেগ ছিল শূন্য। সেই চাকাটি ঘুরতে আরম্ভ করলো, কৌণিক ভরবেগ আর শূন্য রইলোনা, অথচ নিত্যতার নিয়মে তাকে তাই থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হলো চেয়ারটি উল্টো দিকে ঘুরে উল্টো দিকে আর একটি কৌণিক ভরবেগ সৃষ্টি করা। এই দুটা কাটাকুটি হয়ে গিয়ে সিষ্টেমের কৌণিক ভরবেগ এখনো শূন্যই থাকবে, আগের মতই। কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার নিয়ম এভাবে মান্য হলো।

শক্তির নিত্যতা

আর একটি খুব গুরচত্বপূর্ণ পরিমাপ রয়েছে যার নিত্যতার নিয়ম পদার্থবিদ্যায় খুবই মুখ্য ভূমিকা রাখে– সেটি হলো শক্তি। শক্তির ধারণাটি জড়িয়ে আছে কাজের ধারণার সঙ্গে। ধরা যাক কোন বস্তুর উপর একটি বল প্রয়োগ করা হলো। এর ফলে বল প্রয়োগের দিকে এটি যদি কিছু পরিমাণ দূরত্ব সরে যায় তা হলে যে কাজটুকু করা হলো তার পরিমাণ হবে

$$\text{কাজ} = \text{বল} \times \text{দূরত্ব}$$

কাজের একক নেয়া হয় জুল হিসেবে যা স্পষ্টত বলের একক ও দূরত্বের এককের গুণফল অর্থাৎ নিউটন মিটার।

কী হারে কাজটি করা হচ্ছে তাকে বলা হয় ক্ষমতা (পাওয়ার)। কাজেই

$$\text{ক্ষমতা} = \text{কাজ/সময়}$$

ক্ষমতার একক হলো ওয়াট যা স্পষ্টত জুল/সেকেন্ড।

বুঝতেই পারছেন বল প্রয়োগ করে কোন কিছুকে যদি আপনি না নাড়াতে পারেন, যেমন একটি দেয়ালকে, তা হলে কিন্তু কোন কাজ হলোনা। কারণ দূরত্ব এখানে শূন্য।

কাজ করার সামর্থ্যকেই বলা হয় শক্তি (এনার্জি)। তাই শক্তির এককও কাজের এককের মতই জুল। যদিও শক্তির সবটুকু হয়তো ব্যবহারপযোগী কাজে পরিণত হয়না, ঘর্ষণ ইত্যাদিতে নষ্ট হয়, তবুও সবকিছু একত্র করলে শক্তির কোন ক্ষয় নেই, একে এক ধরনের থেকে অন্য ধরনে রূপান্তরিত করা যায় বটে, কিন্তু মোট শক্তি সব সময় একই থাকে। এটিই শক্তির নিত্যতা।

গতি তৈরির দিক থেকে শক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: গতিশক্তি (কাইনেটিক এনার্জি) এবং স্থৈতিকশক্তি (পোটেনশিয়াল এনার্জি)। কোন বস্তু যদি গতিশীল হয় তা হলে তার গতিশক্তি হবে:

$$\text{গতিশক্তি} = \frac{১}{২} \times \text{ভর} \times (\text{বেগ})^{২}$$

অন্যদিকে স্থৈতিকশক্তি নির্ভর করে বস্তুটির অবস্থার উপর, কোন কোন ক্ষেত্রে তার অবস্থানের উপর। যেমন বস্তুটি যদি পৃথিবীর উপর থাকে তাহলে এটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতায় রয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কত উপরে আছে সেটিই এর স্থৈতিকশক্তি নির্ধারণ করবে। যদি এই বস্তুটি একটি স্প্রিং হয়, তা হলে আমরা একে মুচড়িয়ে বা সংকুচিত করে দম দেওয়া অবস্থায় রাখতে পারি। ঐ অবস্থায় তার স্থৈতিকশক্তি রয়েছে মনে করা যায়। স্থৈতিকশক্তি হিসেব করার সময় এর সর্ব নিম্ন অবস্থাকে শূন্য শক্তির অবস্থা হিসেবে নির্দিষ্ট করে নিতে হয়। যেমন পৃথিবীর তলের উপরে থাকার সময় স্থৈতিক শক্তিকে শূন্য ধরা যাচ্ছে অথবা স্প্রিং এর ক্ষেত্রে যেটি স্বাভাবিক দম না দেয়া অবস্থায় থাকাকে। স্থৈতিক শক্তি থাকা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গতির মাধ্যমে শক্তির প্রকাশ আপাত ঘটছেনা বটে, কিন্তু যে কোন সময় তা ঘটতে পারে যেমন মাটির থেকে কিছু উপরে থাকা বস্তুটিকে মাটিতে পড়তে দিলে অথবা দম দেয়া স্প্রিংকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে দিলে। সে ক্ষেত্রে এদের স্থৈতিকশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। আসলে সব ধরনের সিষ্টেমের চেষ্টা হলো সর্বনিম্ন স্থৈতিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া এবং সেই অবস্থাতেই থাকা। এটিও পদার্থবিদ্যার একটি অনিবার্য নিয়ম। আবার যদি বস্তুটিকে উপরে তুলে আনি, বা স্প্রিং এ দম দিই তখন একটি গতির মাধ্যমে এরা স্থৈতিকশক্তি পায়, অর্থাৎ গতিশক্তি স্থৈতিকশক্তিতে রূপান্তরিত হলো। কোন সিষ্টেমের মোট শক্তি হবে:

$$\text{মোট শক্তি} = \text{গতিশক্তি} + \text{স্থৈতিকশক্তি}$$

এখানে মোট শক্তির নিত্যতার নিয়মই আমরা দেখছি। শক্তির এই নিত্যতাকে বজায় রেখে এক ধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন আমরা পেশি শক্তি দিয়ে কোন কিছু ঠেলে নিয়ে যাই তখনও আসলে আমাদের শরীরের কিছু রাসায়নিক শক্তিকে গতি শক্তিতে রূপান্তর করি। ঐ রাসায়নিক শক্তি আবার এসেছে আমাদের খাদ্যের মধ্যে জমা থাকা অন্য রাসায়নিক শক্তি থেকে। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের একটি উদাহরণ নেয়া যাক। ধরা যাক আমরা একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কথা বলছি। এখানে সূর্যের তাপ শক্তি জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করে বৃষ্টি ঘটিয়ে অথবা পর্বতের বরফ গলিয়ে নদীর স্রোতের গতিশক্তি সৃষ্টি করেছে। এটি আবার বাঁধের কারণে উঁচু হয়ে জমে স্থৈতিকশক্তিতে

রূপান্তরিত হয়েছে। এবার সেই উঁচু পানিকে নেমে আসতে দিলে স্থৈতিকশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই পানির স্রোত টারবাইন ও জেনারেটর ঘরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে তা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ঐ বিদ্যুৎ আবার আলো জ্বালালে আলোক শক্তিতে, মোটর ঘুরালে গতিশক্তিতে, ব্যাটারি চার্জ করলে রাসায়নিক শক্তিতে ইত্যাদি- এমনি রূপান্তর চলতেই থাকে। প্রত্যেকবার রূপান্তরের সময় অবশ্য কিছু শক্তি অপচয় হয় - ঐ টুকু রূপান্তর ব্যবহারে আসেনা অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়। সেটুকুও যদি হিসেবে ধরা হয় তা হলে আদিতে যে মোট শক্তি ছিল সবকিছুর পরও সেই শক্তিই থাকে– শক্তির নিত্যতার কারণে।

প্রতিসাম্যের কারণেই নিত্যতা

প্রতিসাম্য (সিমেট্রি) হলো দুই ভিন্ন পরিস্থিতিতে কোন কিছুর সমতা। যেমন বাহ্যিক ভাবে আমাদের শরীরের বাম ও ডান অর্ধেকের মধ্যে প্রতিসাম্য আছে– এদিকে যেমন একটি করে চোখ, কান, অর্ধেক নাম, একটি হাত, একটি পা;

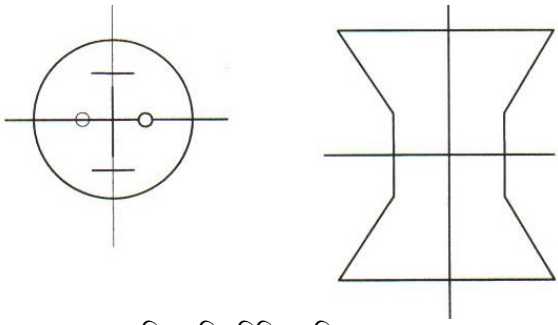

কিছু ছবির বিভিন্ন প্রতিসাম্য:
ডা-বাম প্রতিসাম্য, উপর-নিচ প্রতিসাম্য

অন্যদিকেও হুবহু তাই। শিল্পের নান্দনিকতার ক্ষেত্রে যেমন এর একটি মূল্য আছে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও রয়েছে। পদার্থবিদ্যায় কিন্তু প্রতিসাম্যের একটি বিস্তৃত অর্থ রয়েছে, একটি গাণিতিক সৌন্দর্য ও অপরিহার্যতা রয়েছে যা এর গবেষণায় খুব সহায়ক হয়। গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে কয়েকটি নিত্যতা আমরা দেখলাম তার প্রত্যেকটি এরকম কোন না কোন একটি প্রতিসাম্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

ভরবেগের নিত্যতা রয়েছে কারণ পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলোতে একটি স্থানিক প্রতিসাম্য রয়েছে, অর্থাৎ এসব নিয়ম যে কোন স্থানে সমানভাবে প্রযোজ্য। কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা রয়েছে কারণ আমরা যেই দিকেই বা যেই অভিমুখেই নিয়মগুলো প্রয়োগ করি সব দিকে সমান ভাবে এগুলো প্রযোজ্য হবে। আর শক্তির নিত্যতা এসেছে সময়ের প্রতিসাম্য থেকে। যেই সময়েই আমরা পরীক্ষা করিনা কেন পদার্থবিদ্যার নিয়ম সমান ভাবেই প্রযোজ্য হবে। সিরিজের পরের বইয়ে আমরা দেখবো পদার্থবিদ্যায় আরো নানা রকম চমকপ্রদ প্রতিসাম্য রয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে জড়িত নিত্যতার নিয়মও রয়েছে।

মহাকর্ষের নিয়ম

নিউটনের বিশ্বজনীন মহাকর্ষ

কপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহ পরিক্রমণের তত্ত্বকে কেপলারের হাতে কিছুটা সংশোধিত হয়ে যে রূপ পেয়েছিল তার ব্যাখ্যা গাণিতিকভাবে দিতে গিয়ে নিউটন সূর্য ও গ্রহের মধ্যে একটি আকর্ষণ অনিবার্যভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তাছাড়া তিনি দেখিয়েছেন যে আকর্ষণ বলটি সূর্য থেকে দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যস্ত অনুপাতী হবে। এর মানে দূরত্ব দ্বিগুণ হলে আকর্ষণ ২ এর বর্গ অর্থাৎ ৪ গুণ হ্রাস পাবে। এভাবে সূর্য ও গ্রহগুলোর মধ্যেকার আকর্ষণ নিয়েই নিউটন মহাকর্ষ তত্ত্বের ধারণাটি প্রথম পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যতিক্রমী প্রতিভাটি আরো বেশি ধরা পড়েছে যখন তিনি দেখালেন ব্যাপারটি নেহাৎ সূর্যের আকর্ষণে বা মহাজাগতিক কোন বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। বরং পৃথিবীতে আমরা যে কোন বস্তুকে উপর থেকে পড়তে দিলে বা উপরে ছুড়ে দিলে যখন নিচে পৃথিবীর দিকে তাকে নেমে আসতে দেখি এখানেও ঐ একই বল কাজ করছে। ঐ বস্তু ও পৃথিবী পরস্পরকে একই ভাবে আকর্ষণ করছে। শুধু তাই নয়, সর্বত্র যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যেই কাজ করছে এই আকর্ষণ বল। মহাকর্ষের এই যে বিশ্বজনীনতা– এটিই নিউটনের বিরাট একটি আবিষ্কার। তিনি প্রমাণ করলেন মহাকর্ষের নিয়ম:

$$\text{মহাকর্ষের বল} = G \times \frac{\text{প্রথম বস্তুভর} \times \text{দ্বিতীয় বস্তুভর}}{(\text{দূরত্ব})^২}$$

G এখানে একটি বিশ্বজনীন ধ্রুবক যার সুনির্দিষ্ট একটি মান রয়েছে। সে মান হচ্ছে $G = ৬.৬৭ \times ১০^{-১১}$ নিউটন $(\text{মিটার})^২/(\text{কিলোগ্রাম})^২$ এই মানের মধ্যে $১০^{-১১}$ উৎপাদকটি থাকায় বুঝা যাচ্ছে যে এটি অত্যন্ত ছোট সংখ্যা (কারণ $১০^{-১১}$ মানে ১ এর সঙ্গে এগারটি শূন্য দিয়ে তত ভাগের এক ভাগ), কাজেই মহাকর্ষ বলটিও সাধারণভাবে খুব দুর্বল। কিন্তু সূর্যের অথবা পৃথিবীর ভর এত বিশাল যে এই উভয়ের মধ্যে, বা পৃথিবীর সঙ্গে অন্য কোন বস্তুর আকর্ষণ বেশ বড় হয়ে দাঁড়ায়, যেটি আমরা সর্বক্ষণ অনুভব করছি। মজার ব্যাপার হলো একটি আপেল যেমন

পৃথিবীর দ্বারা আকর্ষিত হয় মহাকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী আপেলও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে গতি লাভের ফলাফল ভিন্ন হয় তাদের নিজ নিজ ভরের কারণে। যত দুর্বলই হোক সাধারণত দুটি বস্তুর মধ্যেও যে মহাকর্ষ রয়েছে তা ক্যাভেন্ডিশ বহু কাল আগে সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এতে দুই কিনারায় দুটি লোহার গোলক থাকা একটি দণ্ড তার দিয়ে ঝুলানো ছিল যেই তার নিজের সঙ্গে নিজে প্যাঁচ খায়না। এখন এদের যে কোন একটি গোলকের কাছে তৃতীয় আর একটি লোহার গোলক আনলে উভয়ের আকর্ষণে ঝুলানো দণ্ডটি যে সামান্য ঘুরে যায় তাই খুব সূক্ষ্ম ভাবে মেপে আকর্ষণটি দেখা গেছে। শুধু তাই নয় এই আকর্ষণ বল মেপে মহাকর্ষের নিয়ম থেকে এভাবে G এর মানও বের করা সম্ভব হয়েছে।

মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণ

মহাকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী যে কোন বস্তু আকর্ষিত হয় পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে। এ জন্যই সব জিনিস এখানে নিচের দিকে পড়ে। আমরা দেখেছি গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন পড়ার সময় যে কোন ভরের যে কোন জিনিস g পরিমাণ এই একই ত্বরণ লাভ করে এবং সে অনুযায়ীই সম ভাবে তার বেগ ক্রমে বাড়তে থাকে। এজন্যই ভারী ও হালকা দুটি বস্তু একই জায়গা থেকে এক সঙ্গে পড়তে দিলে একই সঙ্গে মাটিতে পড়ে (বাতাসের বাধার ক্ষেত্রে দুইটির পার্থক্য দূর করতে পারলে)। একটি বস্তুর ওজন মানে হলো পৃথিবীর আকর্ষণে তার উপর প্রযুক্ত বল। নিউটনের গতির দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী তাই ওজন মানে:

$$\text{ওজন} = \text{বস্তুর ভর} \times \text{পৃথিবীর আকর্ষণ জনিত ত্বরণ} = \text{বস্তুর ভর} \times g$$

ভারি ও হালকা বস্তুর এক সঙ্গে উপর থেকে ফেললে ভারি বস্তুর উপর অধিক বল কাজ করবে বটে কিন্তু আবার ঐ গতির দ্বিতীয় নিয়মের কারণেই বলের ফলে ভারি বস্তুর ত্বরণ কম হয়। কাজেই এই দুটি ফল এক সঙ্গে মিলালে ভারি ও হালকা বস্তুর ত্বরণ একই থাকে।

g এর মান অবশ্য পৃথিবী তল থেকে বস্তুর উচ্চতা অনুযায়ী কিছুটা কম বেশি হবে, কারণ আকর্ষণ বলটি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুটির কেন্দ্রের দূরত্বের উপর নির্ভর

করে। তা ছাড়া ঐ জায়গায় পৃথিবীর অভ্যন্তরের বস্তুগুলোর ঘনত্বের উপরও g কিছুটা নির্ভর করে। এই কারণেই g এর তারতম্য লক্ষ্য করে অর্থাৎ মহাকর্ষ জনিত ত্বরণ মেপে অনেক সময় ধাতু ইত্যাদির খনির সন্ধান পাওয়া সম্ভব অথবা শিলাস্তরের বিন্যাসও জানা যায়। একে গ্র্যাভিমেট্রিক সার্ভে বলা হয়।

কোন বস্তুকে চাঁদে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার ওজন নিলে কত ওজন পাওয়া যাবে? স্বাভাবিক ভাবে চাঁদের ভর পৃথিবীর চেয়ে কম বলে বস্তুটির উপর তার আকর্ষণ বল কম হবে। ফলে এখানে g এর মানও কম হবে; তাই ওজন কম হবে। আসলে পৃথিবীতে ওজনের তুলনায় অন্য কোন গ্রহ-উপগ্রহে গিয়ে নেয়া ওজনের তুলনা করতে পারলে তার থেকেই ঐ গ্রহ বা উপগ্রহের ওজন জানা সম্ভব। আমরা ভর ও ভার (ওজন) এই দুটি শব্দকে অনেক সময় গুলিয়ে ফেলি। এরা ভিন্ন জিনিস। একটি বস্তুর ভর মহাবিশ্বের যে কোন স্থানে নিয়ে গেলে সেখানেও একই থাকবে– এটি জিনিসটির মধ্যে কত বস্তু রয়েছে তার পরিমাণ। চিরায়ত বিজ্ঞানে ভর একটি অপরিবর্তনীয়, নিত্য, বা ধ্রুব বিষয়। ভার বা ওজন কিন্তু নির্ভর করে বস্তুটি কোথায় আছে তার উপর।

উপগ্রহ গ্রহের চারিদিকে ঘোরে কেন?

আগেই দেখেছি বৃত্তাকার কক্ষে কিছু যদি ঘুরতে হয় তা হলে ঐ কক্ষের কেন্দ্রের দিকে একটি কেন্দ্রমুখি বল থাকতে হয়। একটি বিমানও যদি আকাশে বৃত্তাকারে চক্কর খেতে থাকে তা হলে বিমানে বসে থাকা মানুষ এ বল অনুভব করবেন, এবং বিমানের বডিও বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে একটি পীড়নের আওতায় আসবে, ইঞ্জিনকে বাড়তি কাজ করতে হবে। পৃথিবী যখন সূর্যের চারিদিকে ঘুরে অথবা চাঁদ বা কোন কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে, সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রে থাকা সূর্য বা পৃথিবীর আকর্ষণই কেন্দ্রমুখি বলের কাজ করছে। এই বলই গ্রহ বা উপগ্রহকে পরিক্রমণে রেখেছে। ব্যাপারটি আরো একটু ভাল ভাবে দেখা যাক।

আসলে গতির প্রথম নিয়ম অনুযায়ী বল প্রযুক্ত না হলে যে কোন বস্তু সরল রেখায় সমগতিতে চিরকাল থাকার কথা (অথবা স্থির)। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে উপগ্রহটি ওভাবে সরল রেখায় সমবেগে চলে যেতে পারছেনা, বরং

পৃথিবীতে পড়ে যাওয়ায় অবস্থার চলে আসছে। কিন্তু তার বেগ এমনটি যদি হয় যে সে ওভাবে পুরাপুরি পড়েও যেতে পারছেনা, আবার পৃথিবীর টানকে একেবারে অগ্রাহ্য করে মহাশূন্যে চলেও যেতে পারছেনা, তখন তা বেগ অনুযায়ী পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত কাছে অথবা দূরে একটি কক্ষ পথ নিয়ে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করতে থাকে। আকর্ষণ বলটিই এই পরিক্রমণের নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। প্রতি মুহূর্তে এটি কিন্তু আসলে পৃথিবীতে পড়ে যাবার উপক্রম করছে, কিন্তু পড়ে যেতে না পেরে ঘুরে চলছে। এই আকর্ষণের মায়া কাটিয়ে, পরিক্রমণও আর না করে, মহাশূন্যে সুদূরের পথে ছুটে যেতে হলে ঐ উপগ্রহ বা মহাশূন্যযানকে নিজের রকেট ব্যবহার করে তার শক্তিতে আরো বেশি ত্বরণ লাভ করতে হবে, এবং নিষ্ক্রমণ বেগ নামে পরিচিত একটি সুনির্দিষ্ট সর্বনিম্ন বেগ অন্তত লাভ করতে হবে।

যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাশূন্য স্টেশন এভাবে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে তার ঐ প্রতিমুহূর্তে পড়ে যাওয়ার উপক্রমের ফলে একটি অদ্ভুত বিষয় দেখা যায়।

স্পেস ষ্টেশনে মহাশূন্যচারীর ওজনহীন অবস্থা

পড়ন্ত অবস্থায় কোন কিছুর কোন ওজন থাকেনা, পড়ন্ত কোন মানুষও নিজের কোন ওজন অনুভব করেনা। আমি যদি কোন লিফটের ভেতরে থাকি, এবং যান্ত্রিক দুর্ঘটনার কারণে লিফ্‌টি যদি ঢিলের মত নিচে পড়তে থাকে তা হলে মাটিতে পড়ে আহত হবার আগের সময়টিতে আমি কিন্তু লিফটের ভেতরে ওজনহীন অবস্থায়

থাকবো এবং উপরের দিকে একটু ধাক্কা দিলেই ভেসে গিয়ে লিফ্টের ছাদে আমার মাথা গিয়ে ঠেকবে। অনেক সময় আবহাওয়ার দুর্যোগে বিমান সাময়িক ভাবে হঠাৎ উচ্চতা হারিয়ে নিচের দিকে নেমে আসলে বিমান যাত্রীরাও এরকম ভাসার অনুভুতি পান এবং সীটবেল্ট বাঁধা না থাকলে বিমানের ভেতর সেভাবে ভেসে যাবেন। ঐ যে উপগ্রহ বা স্পেস স্টেশন সব সময় পড়ার অবস্থায় থাকে সে কারণে স্পেস ষ্টেশনে থাকা মহাশূন্যচারীরা সব সময় ওজনহীন অবস্থায় থাকেন; ধাক্কা খেলেই এদিক ওদিক ভেসে যান, বিছানার সঙ্গে বেঁধে না ঘুমালে সেখানেও স্থির থাকতে পারেন না। স্পেস ষ্টেশনের ভেতরে সব কিছুই ওজনহীন ভাসতে থাকে যদি না তা আটকানো থাকে। স্পেস ষ্টেশন থেকে আসা ছবিতে এগুলো আমরা দেখে থাকি। কাজেই ওখানকার ওজনহীনতা পৃথিবী থেকে দূরে আছে বলে নয়, বরং সর্বক্ষণ পৃথিবীর দিকে পড়ে যাচ্ছে বলে। আর উপগ্রহ যে পড়ে না গিয়ে বা নিজে কোন শক্তি ব্যয় না করে ক্রমাগত পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে তার কারণ উপগ্রহটির মূল সরল রৈখিক গতি (যা উর্দ্ধ স্থানে প্রায় বায়ুর ঘর্ষণহীন)। মাধ্যাকর্ষণ বলটি উপগ্রহকে যে গতি দিচ্ছে প্রয়োজনে গুলতির মত উপগ্রহকে ছুড়ে অনেক বেগে দূরে পাঠিয়ে দিতে তাকে ব্যবহার করা সম্ভব। আর এমনটিই করা হয়েছিল দুর্ঘটনা কবলিত এপলো-১৩ এর মহাশূন্যচারীদেরকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে। সেক্ষেত্রে অবশ্য চাঁদের মহাকর্ষ বলকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯৭০ সালে চাঁদে অবতরণকারী মানুষ্যবাহী তৃতীয় মহাশূন্যযান হিসেবে এপলো-১৩ যাত্রা পথে অক্সিজেন ট্যাংকে বিস্ফোরণে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। চাঁদে নামার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়ে তিন জন মহাশূন্যচারীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাটিকে মনে করা যেতে পারে চিরায়ত গতিবিদ্যার এক অনবদ্য সাফল্য। বিস্ফোরণের ফলে মূল যানের উত্তাপ, বাতাস, ইত্যাদির অবস্থা জীবনের প্রতিকূল হয়ে পড়াতে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন মহাশূন্যযানের চাঁদে অবতরণকারী অংশে। গতির নিরবিচ্ছিন্নতায় অত্যন্ত বিপদসংকুল অবস্থায় পুরো মহাশূন্যযানটি চাঁদের কাছে গিয়ে মূল পরিকল্পনায় যেভাবে কম্যাণ্ড মড্যুলের চাঁদের কক্ষ পথে পাক খাওয়ার কথা সেভাবেই পাক খাওয়া শুরচ করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটি ছিল চাঁদের আকর্ষণ বলটিকে কাজে লাগিয়ে গতি প্রাপ্ত হয়ে সেই গতিতেই পৃথিবীতে ফিরে আসা। মহাশূন্য যানটি যখন পৃথিবীর বিপরীত দিকে চাঁদের উল্টো পিঠ ঘুরে

সামনে আসছে ঠিক তখন চাঁদে নামার লুনার মড্যুলটির রকেট অল্প খানিক্ষণের জন্য চালু করা হয়েছে। একেবারে চুলচেরা হিসেবে করে মহাশূন্যচারীরা রকেটটি ঠিক তত খানিই চালিয়েছেন যাতে পাক খেয়ে আবার চাঁদের পৃথিবীমুখি দিকে আসার সময় মহাশূন্যযানটি কক্ষ পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় বাড়তি গতির কারণে; এবং চাঁদের আকর্ষণ বলে যে গতিতে ঘুরছিল তা নিয়েই পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে পারে।

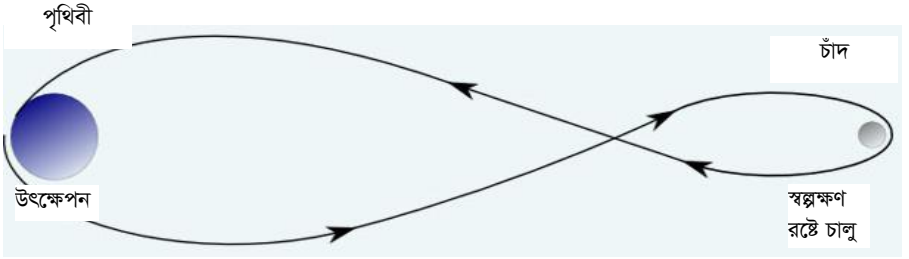

পূর্ঘটনা কবলিত এপলো-১৩ যে পথে চাঁদের কক্ষপথে গিয়েছিল এবং চাঁদের আকর্ষণ বলকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিল।

এপলো-১৩ ঠিক সেভাবেই ফিরে এসেছে। রকেটটি যদি সামান্য এতটুকুও বেশি চালানো হতো তা হলে তাঁরা পৃথিবীতে না পৌঁছে অন্য কোন দিকে গিয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যেতেন। আর যদি যথেষ্ট পরিমাণ না চালানো হতো তা হলে তাঁরা চাঁদের কক্ষপথেই আবর্তন করতে থাকতেন। ব্যাপারটি অনেকটা এথলেটিক্স প্রতিযোগিতার হ্যামার থ্রোর মতো– যেখানে প্রতিযোগী একটি দড়ির মাথায় ভারী গোলককে মাথার উপরে ক্রমাগত ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় ছেড়ে দেন এবং গোলকটি এবার সোজা দূরে কোথাও গিয়ে পড়ে। ঐ ঘুরাবার শক্তিটিই এখানে দূরে পাঠাবার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এপলো-১৩ এর ক্ষেত্রে চাঁদের মহাকর্ষ বলকে এভাবে ব্যবহার না করলে তার নিজের যে জ্বালানি ছিল তার শক্তিতে পৃথিবীতে ফিরে আসা অম্ভব ছিলনা।

চিরায়ত গতিবিদ্যার নিয়মগুলো যে কত সঠিক, ভয়াবহ দুর্ঘটনা কবলিত এপলো-১৩ এর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন তারই একটি নাটকীয় প্রকাশ।

তাপ ও গতি

তাপের গতি তত্ত্ব (কাইনেটিক থিওরি)

তাপ জিনিসটি কী? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হলে তাপ আণবিক গতিরই প্রকাশ। আর উত্তাপ (টেম্পারেচার) হচ্ছে এই তাপের বহি:প্রকাশ। এতে মনে করা হয় যে পদার্থে অণুগুলো সব সময় একটি নড়াচড়ার অবস্থায় রয়েছে। গ্যাসের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। গ্যাসের অণুগুলো সব সময় ইতস্তত নাচানাচি করছে। গ্যাসটির উত্তাপ যত বেশি হবে বুঝতে হবে এই ইতস্তত গতির গড়পড়তা বেগ তত বেশি। এক একটি অণুর ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে অবশ্য কোন অণুর গতি অনেক বেশি উত্তাপেও কম হতে পারে, অথবা অনেক কম উত্তাপেও বেশি হতে পারে। এই নাচানাচিতে অণুগুলো যখন গ্যাসের আধারের দেয়ালে (যেমন বেলুনের ভেতরে) এসে আঘাত করে তখন সেখানে চাপের সৃষ্টি হয়। তাই বেশি উত্তাপে অণুগুলোর গড়পড়তা বেগ বেড়ে গিয়ে আরো সজোরে দেয়ালের উপর পড়ে বলে গ্যাসের চাপ সমানুপাতিক ভাবে বাড়ে (চার্লসের নিয়ম)। অন্য দিকে ছোট আয়তনের মধ্যে গ্যাস রাখলে আয়তন যত বড় করা হবে গ্যাসের চাপ আয়তনের সঙ্গে ব্যস্ত সমানুপাতে কমে যায় (বয়লের নিয়ম)। এ সব নিয়ম বিজ্ঞানীরা বাস্তবে পরীক্ষায় দেখতে পেয়েছেন এবং তা তাপের গতিতত্ত্ব থেকে চমৎকার ব্যাখ্যাও করা গেছে।

গতির সঙ্গে তাপের যে সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা বাহ্যিক ভাবেও দেখতে পাই। দুই হাত দ্রুত ঘর্ষণে হাত গরম হয়ে পড়ে, যন্ত্রপাতিও ক্রমাগত চলাচল করতে গিয়ে ঘর্ষণে গরম হয়ে পড়ে। ল্যাবোরেটরিতে সযত্নে পরিমাপ করে ঘুটনির সাহায্যে পানিকে দ্রুত ঘুঁটতে থেকে একদিকে ঘুটনির গতি শক্তি মেপে অন্য দিকে পানির তাপ মেপে তাপের গতি-রূপের একটি পরিমাপও বের করা যায় (তাপের মেকানিক্যালে ইক্যুইভ্যালেন্ট)। তাপ মাপারও সুন্দর প্রক্রিয়া রয়েছে। কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগের আগের উত্তাপ ও পরের উত্তাপ যদি জানা থাকে তা হলে কত তাপ প্রয়োগ করা হলো তা বুঝা যাবে নিচের সমীকরণ থেকে:

$$\text{তাপ} = \text{বস্তুটির ভর} \times C \times \text{উত্তাপের বৃদ্ধি}$$

C এই ধ্রুবকটি হচ্ছে বস্তুটির একটি নিজস্ব গুণ– তার আপক্ষিক তাপ বা তাপ ধারণ ক্ষমতা। যে বস্তুর C বেশি তা বেশি তাপ ধারণ করতে পারে। পানির C যথেষ্ট বেশি যে কারণে আমরা বয়লার বা হট ওয়াটার বোতলে তাপ জমিয়ে রাখতে পানি ব্যবহার করি। পানির C-কে এক ধরে তার তুলনায় অন্য বস্তুর C পানির আপেক্ষিকে ঠিক করা হয় বলেই তা আপেক্ষিক তাপ।

কোন বস্তুতে তাপ দেয়া শুরচ করলে প্রথম দিকে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন না হয়ে শুধু উত্তাপ বাড়তে থাকে। কিন্তু যেই মুহূর্তে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে– কঠিন বস্তু তরল হতে থাকে বা তরল বস্তু গ্যাস হতে থাকে– আরো তাপ দিলেও তা আর উত্তাপ বৃদ্ধি ঘটায় না। তাই যতক্ষণ বরফ গলতে থাকে ০° সেলসিয়াসে থাকে, আর পানি ফুটে বাষ্প হতে থাকে ততক্ষণ উত্তাপ ১০০° সে: তে স্থির থাকে। ঐ পুরো তাপটিকে বলা হয় সুপ্ত তাপ। এখানে বাড়তি তাপটুকু উত্তাপ বৃদ্ধিতে প্রকাশিত না হয়ে বরং অবস্থা পরিবর্তনের কাজে ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে। তাই এটি অপ্রকাশিত বা সুপ্ত তাপ। সব বস্তুর নিজস্ব গলার বা বাষ্পীভূত হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সুপ্ত তাপ আছে।

তাপগতিবিদ্যা

শক্তির নিত্যতার যে নিয়মটি আমরা দেখেছি তাকে তাপগতিবিদ্যার প্রথম নিয়মও বলা হয়। এটি বলছে: যত রকম ক্রিয়া-বিক্রিয়াই ঘটুক না কেন সিষ্টেমের মোট শক্তি সব সময় অপরিবর্তিত থাকবে। এই তাপগতিবিদ্যা হচ্ছে বিজ্ঞানের সেই শাখা যা তাপকে শক্তি আর কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। কাজের হিসেব নিতে গিয়ে এতে বাহ্যিক কিছু গুণাগুণের বিবেচনাই যথেষ্ট– যেমন চাপ, আয়তন ইত্যাদি। এর জন্য আণবিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোন ধারণার প্রয়োজন হয়না। এই তাপগতিবিদ্যার নিয়মগুলো থেকে ইঞ্জিনের কাজকর্ম, রাসায়নিক বিক্রিয়ার কিছু গতিপ্রকৃতি, পদার্থের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর (যেমন কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থা) ইত্যাদি নানা ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব।

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়মটির বক্তব্য হলো তাপের সর্বাংশকে যান্ত্রিক কাজে রূপান্তরিত করা যায়না, তেমনি যান্ত্রিক কাজকেও সর্বাংশে তাপে রূপান্তরিত করা

যায়না। অর্থাৎ এ ধরনের রূপান্তরে শতকরা একশ' ভাগ দক্ষতা অর্জন অসম্ভব। এর অর্থ হচ্ছে উলিøখিত ধরনের সব প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু শক্তি সব সময় ব্যবহারের বাইরে চলে যাচ্ছে; একটি সার্বিক অপচয় এর মধ্যে রয়েছে। একে আরেক ভাবে বললে প্রকৃতি বিশ্বজনীন ভাবে সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শৃঙ্খলার অবস্থার থেকে বিশৃঙ্খলার অবস্থার দিকে যাচ্ছে। তাপগতিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি জিনিস রয়েছে যার নাম হচ্ছে এন্ট্রপি যা কিনা বিশৃঙ্খলার একটি পরিমাপ। যে কোন ক্রিয়ার মাধ্যমেই এ বিশ্ব-এনট্রপি শুধুই বাড়ে, কখনই কমেনা। যেমন বোতল খুললে তাতে থাকা উদ্বায়ী গ্যাস বা সেন্ট ওখান থেকে বের হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ছড়িয়ে পড়া উদ্বায়ী বস্তু কখনো ফিরে এসে বোতলে ঢুকে পড়ে না।

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়মটিকে আরো একভাবে দেখা যায় যা দক্ষতা ১০০% না হওয়া, বা এনট্রপি শুধুই বাড়ার সমার্থক। তা হলো তাপ শুধু গরম জিনিস থেকে ঠান্ডা জিনিসের দিকেই যেতে পারে, ঠান্ডা জিনিস থেকে গরম জিনিসের দিকে যেতে পারেনা। তা হলে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে রেফ্রিজারেটরে ভেতরে ঠান্ডা বাইরে গরম, অথচ আরো তাপ এর ঠাণ্ডা ভেতর থেকে গরম বাহিরে যেতে

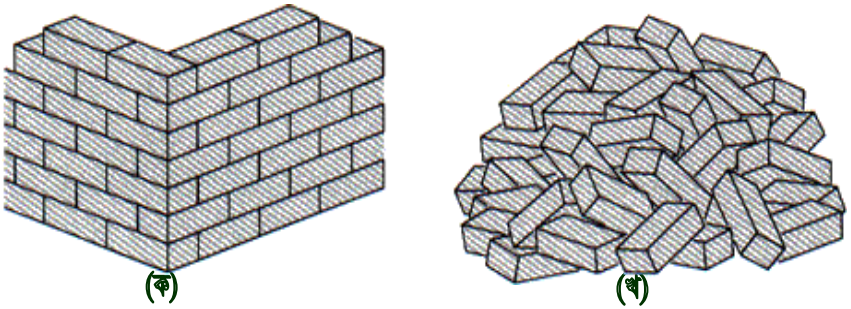

তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী এনট্রপি সব সময় বাড়ে, কখনো কমেনা। (ক) অবস্থা থেকে পরিস্থিতি (খ) অবস্থার দিকে যেতে পারে, বাইরের সাহায্য ছাড়া কখনো (খ) থেকে (ক) এ নয়।

পারছে।তা হলে এটি কি তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়ম মানছেনা? না ব্যাপারটি তা নয়। রেফ্রিজারেটরকে এ ভাবে উলটো কাজ করাবার জন্য বাইরে থেকে বিদ্যুৎ

শক্তি দিয়ে এর মোটর-কম্প্রেসার চালাবার প্রয়োজন হচ্ছে। রেফ্রিজরেটরকে একটি নিজস্ব সিস্টেম মনে করলে সিষ্টেমের মধ্যে কিন্তু ব্যাপারটি সম্ভব নয়– বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া। তেমনি চিনির তরল সিরা থেকে যখন মিছরির সুন্দর স্ফটিক গড়ে উঠে, তখন বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলার দিকে যায়, এনট্রপি না বেড়ে বরং কমে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বাইরে থেকে শক্তি নিয়ে তবে তা সম্ভব হয়। ভেতর বাহির সব কিছু বিবেচনায় আনলে এ ক্ষেত্রেও বিশ্বের মোট এনট্রপি কিন্তু বাড়ে।

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়ম চমৎকার ভাবে কালের প্রবাহের দিকটি নির্দিষ্ট করে দেয়। অনেক সময় কোন ঘটনা এমন হতে পারে যে অতীতের দিকের ঘটনা প্রবাহ ও ভবিষ্যতের দিকে ঘটনা প্রবাহ একই রকম মনে হতে পারে। যেমন ক্রমাগত চালু রাখা একটি পেণ্ডুলামের চলচ্চিত্রে যদি আমরা দেখি সেই চলচ্চিত্র স্বাভাবিক দিকে চালালে যা দেখবো, উল্টো দিকে চালালেও একই দেখবো– দেখে বুঝতে পারবোনা কোন দিকে চালানো হচ্ছে। কিন্তু সার্বিক বাস্তব বিশ্বে এমনটি হবার জো নেই, কারণ এনট্রপি বাড়তে দেখেই আমরা বুঝবো এটিই ভবিষ্যতের দিক– যেদিকে মানুষের দেহে জরা আসে, যেদিকে গোছালো জিনিস আগোছালো হয়, যেদিকে তাপশক্তি ক্রমেই বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে কাজ করার ক্ষেত্র থেকে হারিয়ে যায়।

বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উদ্ভবের কাল থেকেই তাপগতিবিদ্যার এই নিয়মগুলো ইঞ্জিনের দক্ষতা, এর সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে ইঞ্জিনের উন্নয়নে খুবই সহায়ক হয়েছে। তবে এর গুরচত্ব শুধু প্রকৌশলগত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় নিয়মের মধ্যে দার্শনিক, তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক অনুধাবনের এত গুরচত্বপূর্ণ সব বিষয় রয়েছে যে বিজ্ঞানী ও লেখক সি পি স্নো ষাটের দশকে তাঁর বিখ্যাত 'টু কালচার' বক্তৃতায় তাঁর প্রতিপাদ্যের উদাহরণ হিসেবে একেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি দেখাতে চাচ্ছিলেন যে প্রধানত সাহিত্য-কলার সংস্কৃতিতে শিক্ষিত মহল বিজ্ঞান সম্পর্কে জানাটাকে যে আদৌ গুরচত্ব দিচ্ছেন না তাতে সমাজ দু'রকম সংস্কৃতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ছে, যা ক্ষতিকর। এজন্য তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষিতদের কাছ থেকেও যেমন শেক্সপীয়রের রচনা সম্পর্কে জানা আবশ্যক মনে করা হয়, তেমনি পূর্বোক্তদের কাছ থেকেও তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়মের তাৎপর্য বুঝাটি আশা করা উচিত!

তাপগতি বিদ্যার তৃতীয় নিয়ম হলো, পরম শূন্য উত্তাপ সম্ভব নয়। উত্তাপের একটি পরম স্কেল ঠিক করতে গিয়ে (যা বিশেষ কোন বস্তুর গুণের উপর নির্ভর করবেনা) পরম শূন্য (এবসল্যুট জিরো) উত্তাপের ধারণাটি এসে পড়ে, যে উত্তাপে সব রকম

উত্তাপের পরম স্কেল বা কেনভিন স্কেলে কোন উত্তাপটি কত ডিগ্রি কেলভিন

আণবিক গতি স্থির হয়ে পড়বে। এটিই সম্ভাব্য সর্বনিম্ন উত্তাপ, যা ০° সেলসিয়াসেরও ২৭৩ ডিগ্রি নিচে অর্থাৎ-২৭৩° সে:। উত্তাপের

যে স্কেলে এই পরম শূন্য উত্তাপকে ০° ধরা হয় সে স্কেলটিকে বলা হয় পরম স্কেল (এবসল্যুট স্কেল) অথবা কেলভিন স্কেল। এর চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয় K বা কে:। গলন্ত বরফের উত্তাপ যা সেলসিয়াস স্কেলে ০° সে: সেটি কেলভিন স্কেলে হবে ২৭৩° কে:। যেহেতু উভয় স্কেলে এক ডিগ্রির পরিমাণ সমান, সেলসিয়াস স্কেলে ২৭৩ যোগ করলেই কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা পাওয়া যায়। ধারণায় ০° কে: বা পরম শূন্য উত্তাপ থাকলেও তাপগতিবিদ্যার তৃতীয় নিয়ম অনুযায়ী বাস্তবে এটি অসম্ভব, যদিও এখন এই উত্তাপের অতি কাছের উত্তাপ অর্জন সম্ভব হয়েছে– এক ডিগ্রির অতি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পরিমাণ কাছে, কিন্তু একেবারে হুবহু ওটি কক্ষণো অর্জন সম্ভব নয়।

আলোক তরঙ্গ, বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ

তরঙ্গ

পুকুরে ঢিল ছুড়লে পানিতে ঢিল পড়ার জায়গাটিকে কেন্দ্র করে তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। তাতে কী হয়? বিভিন্ন জায়গায় পানি স্থানীয়ভাবে উঠানামা করে, মানে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনটি এগিয়ে যায় বটে কিন্তু সেখানকার পানি এগিয়ে

পানির তরঙ্গ। এখানে পানি স্পন্দিত হচ্ছে তরঙ্গের গতি দিকের সঙ্গে লম্ব ভাবে। তাই এটি আড়াআড়ি (ট্রান্সভার্স) তরঙ্গ।

যায়না। তরঙ্গ মাত্রই এরকম স্পন্দনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে স্পন্দনটি ঘটছে তরঙ্গের গতির দিকের সঙ্গে লম্ব ভাবে; কিন্তু সব তরঙ্গের ক্ষেত্রে তা হয়না। যে তরঙ্গে লম্বভাবে স্পন্দন হয় সেগুলোকে আড়াআড়ি (ট্রান্সভার্স) তরঙ্গ বলা হয়। একটি দীর্ঘ স্প্রিং এর প্রান্তকে সংকুচিত করে ছেড়ে দিলে সেখানে বার বার সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে সেটিও স্পন্দিত হতে থাকে। এই স্পন্দনও স্প্রিং বরাবর এগিয়ে যায়; এটিও একটি তরঙ্গ। কিন্তু এক্ষেত্রে স্পন্দনটি তরঙ্গের গতির দিকেই ঘটে। এরকম গতির দিকের স্পন্দনযুক্ত তরঙ্গকে বলা হয় সমদিক

(লংগিচ্যুডিন্যাল) তরঙ্গ। এ রকম তরঙ্গের সঙ্গেও আমরা যথেষ্ট পরিচিত। শব্দ এমনি একটি তরঙ্গ। বাতাস বা শব্দের অন্য কোন মাধ্যমে সংকোচন প্রসারণের স্পন্দনই শব্দ তরঙ্গ রূপে স্পন্দনের একই দিকে এগিয়ে যায়। তরঙ্গের যে সব উদাহরণ দেখলাম তাতে সব ক্ষেত্রে কোন না কোন মাধ্যম আমরা দেখছি। কিন্তু মাধ্যম ছাড়াও তরঙ্গ হতে পারে, সেটি পরে দেখবো।

সব তরঙ্গেরই কতগুলো পরিমাপ থাকে। তরঙ্গ মাত্রেই স্পন্দন বার বার পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। একটি পুরো স্পন্দনের যে দৈর্ঘ সেটিকে বলা হয় তরঙ্গ-১দহার। একটি বিশেষ বিন্দু দিয়ে সেকেণ্ডে কতটি সাইকেল বা পুরো স্পন্দন চলে যায়

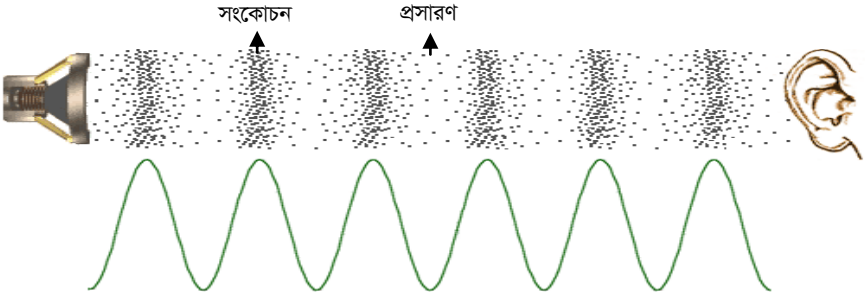

শব্দ তরঙ্গ।এখানে মাধ্যমটি (যেমন বাতাস) স্পন্দিত হচ্ছে তরঙ্গের গতি দিকের একই দিকে। তাই এটি সমদিক (লংগিচ্যুডিন্যাল) তরঙ্গ। তরঙ্গটি বুঝানোর গ্রাফে অবশ্য স্পন্দনটি গতিদিকের সঙ্গে লম্বভাবেই দেখানো হয় (নিচের চিত্র)।

সেটিই ফ্রিকোয়েন্সি। সেকেণ্ডে সাইকেল বা হার্ৎস– এই এককে ফ্রিকোয়েন্সিকে প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেক তরঙ্গের একটি বিস্তার (এম্পিøøচিউড) রয়েছে যা আসলে স্পন্দনেরই শীর্ষ বিন্দুটি ভূমি বা স্বাভাবিক অবস্থান থেকে কতদূরে তারই পরিমাপ। শব্দের ক্ষেত্রে আওয়াজটি কত বড় তা ঠিক হয় এই বিস্তার কত বেশি বা কম তার উপর। কিন্তু শব্দটি কত তীক্ষ্ণ খাদের বা মোটা খাদের তা নির্ভর করে শব্দের ফ্রিকোয়েন্সির উপর। তরঙ্গের একটি গতি আছে যা মাপা যায়। যেমন দূরে কোন শ্রমিককে হাতুড়ি পেটাতে দেখলে এবং দূরত্বটি জানা থাকলে তাঁর হাতুড়ি লক্ষ্যবস্তুকে স্পর্শ করতে দেখার কতক্ষণ পর এর শব্দটি শুনতে পেলাম সেই সময়টুকু মেপে শব্দ তরঙ্গের গতি মাপা যায়।

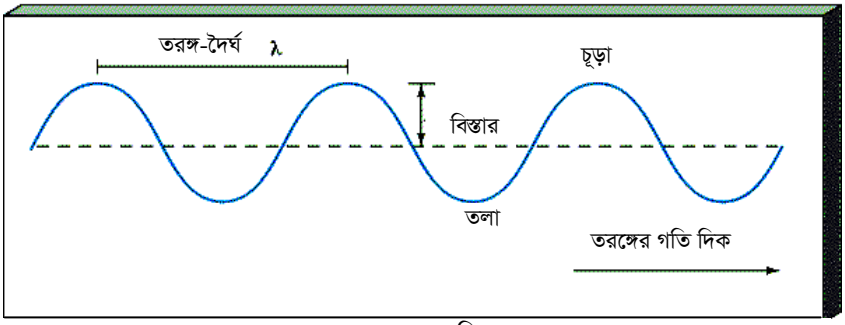

তরঙ্গের নানা পরিমাপ

আলোর তরঙ্গ রূপ

আলো নিয়ে কয়েক শত বছরের নানা পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে তরঙ্গের সব ধরনের আচরণ আলোর মধ্যে দেখা যায়। সেভাবে বুঝা যায় যে আলো একটি তরঙ্গ। তরঙ্গের এই আচরণগুলো কী তা দেখা যাক। তরঙ্গের বেগের কথা বলা হয়েছে। আলোর ক্ষেত্রে এই বেগ এত বেশি যে এক সময় মনে করা হতো আলো যেন তাৎক্ষণিকভাবে যে কোন জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু ১৬৭৬ সালের সময় থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন আলোও কোথাও পৌঁছতে কিছু সময় নেয়। তাঁরা এটি শুধু বুঝতেই পারেননি সূক্ষ্ম নানা কৌশলে তাঁরা এই এই অতি ক্ষুদ্র সময় ও আলোর গতিবেগ পরিমাপ করেছেন। মোটামুটি সঠিক ফলও পেয়েছেন। এখন আমরা নিখুঁত ভাবে এই বেগ জানি ২.৯৯৭৯৩ $\times ১০^{৮}$ মিটার/সে:, প্রায় সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার। এই বিপুল বেগে সাধারণ দূরত্ব অতিক্রম করতে আলোর অত্যন্ত কম সময় লাগে বলেই পরিমাপটি কঠিন ছিল। কিন্তু এখন সহজলভ্য ওসিলোস্কোপেই এমন ক্ষুদ্র সময় মাপা যায়; তাই আলোর বেগ নির্ণয় এখন যে কেউ সহজে করতে পারে।

সব তরঙ্গের প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত (ভিন্ন মাধ্যমে যাবার সময় বেঁকে যাওয়ার) হবার গুণ আছে, আলোরও এই দুই গুণ স্পষ্টতই আছে। সব তরঙ্গ একটি ছোট ছিদ্র, ফাটল বা কিনারা ঘেঁষে যাবার সময় বেঁকে যায়, ওর থেকে নূতন করে ছড়িয়ে

পড়ে, যাকে বলা হয় ড্রিফ্র্যাকশন। এজন্যই দরজা বা দেয়ালের আড়ালে বাইরে থেকে ঘরের কথা শুনা যায়– দেয়ালের কিনারায় শব্দ তরঙ্গ ড্রিফ্র্যাকশনে বেঁকে যায় বলে। আবার পাশাপাশি উৎস থেকে দুটি তরঙ্গ একই জায়গা দিয়ে নিয়ে গেলে তরঙ্গগুলো পরস্পর উপরিপাতিত হয়ে ঐ জায়গায় শুধু তার যোগ-বিয়োগের ফলাফল তরঙ্গটিই প্রকাশ পায়– একে বলা হয় ইন্টারফেরেন্স। উদাহরণ স্বরূপ একটি তরঙ্গের শীর্ষ বরাবর আরেকটি তরঙ্গের শীর্ষ যদি উপরিপাতিত হয়, তা হলে সেখানে যে ফলাফল তরঙ্গ হবে তা অধিক স্পন্দিত হবে, তার বিস্তার হবে উভয়ের বিস্তারের যোগফল। অন্যদিকে একটি তরঙ্গের শীর্ষের সঙ্গে অন্য তরঙ্গটির বিপরীত শীর্ষ যদি উপরিপাতিত হয় তা হলে উভয়ে কাটাকুটি হয়ে বিস্তার সেখানে কমে যাবে, শূন্যও হয়ে যেতে পারে। পানির তরঙ্গ সহ সব রকমের তরঙ্গে এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। এর ফলে উপরিপাতিত জায়গায় ইন্টারফারেন্সের একটি প্যাটার্ন সৃষ্টি হয়। তাতে পর পর কোথাও তরঙ্গের তীব্রতার উপস্থিতি এবং কোথাও তীব্রতার অনুপস্থিতি দেখা দেয়, যেমন আলোর ক্ষেত্রে আলোকিত ও অন্ধকার অংশের ঝালরের!

আলোর তরঙ্গ ধর্ম

তরঙ্গের এই সব গুণই আলোর মধ্যে সুন্দর দেখা যায়। একটি খুব সরচ ফাটলের মধ্য দিয়ে আলোকে নিয়ে গেলে ডিফ্র্যাকশনের ফলে একে বাঁকতে দেখা যায়, এর ভেতর দিয়ে পতিত আলো ঠিক ফাটলটির আকৃতিতে এটি সীমাবদ্ধ থাকে না।

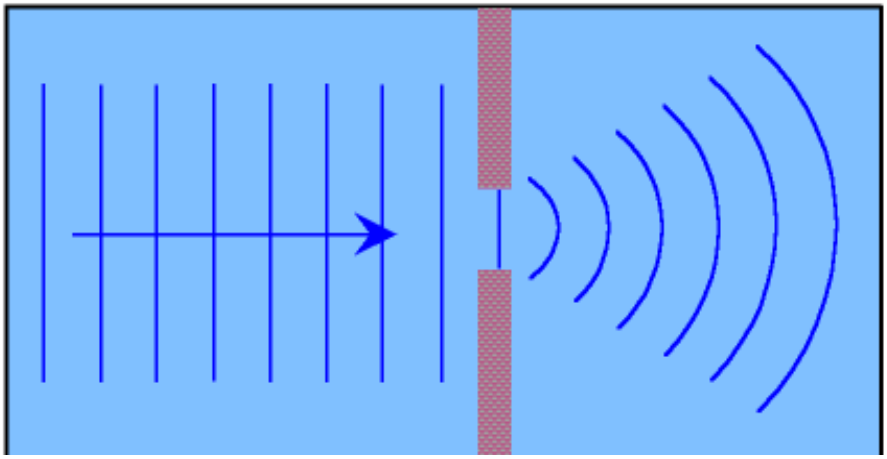

ফাঁকের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আলোর ডিফ্রাকশন

একই আলোক উৎস থেকে আসা আলোকে কাছাকাছি দুটি খুব সরচ কাটা জায়গার (স্লিট) মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলে সেই কাটা জায়গা দুটি আলোর দুটি নূতন উৎস হিসেবে কাজ করে। তখন ওগুলোর সামনে সুবিধাজনক দূরত্ব একটি পর্দা রাখলে তাতে পর পর আলোকিত ও অনালোকিত অংশের ঝালর দেখা যায় ইন্টারফেরেন্স প্যাটার্ন হিসেবে। দুই উৎস থেকে আসা দুই আলোক তরঙ্গরাজির পরস্পর উপরিপাতনে যে ইন্টারফেরেন্স ঘটছে তার ফলেই এই ঝালর প্যাটার্ন। উৎস থেকে দূরত্ব, পর পর আলোকিত অংশগুলোর ব্যবধান, দুই কাটা জায়গার মধ্যে ব্যবধান ইত্যাদির মাপ থেকে তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদির সূক্ষ্ম পরিমাপ সম্ভব হয় তরঙ্গের গাণিতিক প্রকাশের অংক কষে। এ সবের ফলে স্পষ্ট বুঝা গেছে যে আলো এক প্রকার তরঙ্গ।

পোলারয়ড নামের বিশেষ ধরনের সুশৃঙ্খল আণবিক বিন্যাসে গড়া পাতের মধ্য দিয়ে আলোকে যেতে দিলে খাড়া বিন্যাসের সঙ্গে আড়াআড়ি রাখা আরেকটি পোলারয়েড দিয়ে সেটি আর যেতে পারেনা। কিন্তু দ্বিতীয় পোলারয়েডটি যদি আগেরটির মত খাড়া স্থাপন করা হয় তা হলে দিব্যি চলে যেতে পারে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে আলোক তরঙ্গের যে স্পন্দন তা তরঙ্গ গতির দিকের সঙ্গে লম্ব ভাবে ঘটে এবং এর সঙ্গে লম্বভাবে থেকে নানা দিকে ঘটে, কিন্তু পোলারয়েডের মধ্য দিয়ে

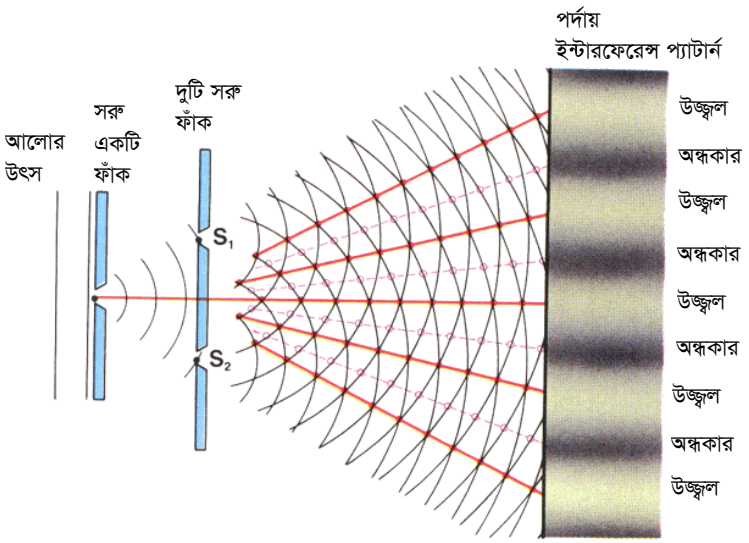

আলোর ইন্টারফেরেন্স। S_1 এবং S_2 থেকে যাওয়া আলো পরস্পরের সঙ্গে ইন্টারফেরেন্স করে পর্দায় পর পর উজ্জ্বল ও অন্ধকার প্যাটার্নের সৃষ্টি করে। আলো তরঙ্গ বলেই এটি সম্ভব হচ্ছে।

যাবার সময় শুধু পোলারয়েডের বিন্যাসের সঙ্গে সমান্তরাল যে সব স্পন্দন শুধু সেগুলোই যেতে পারে। তরঙ্গের এই গুণকে বলা হয় পোলারাইজেশন, যা শুধু ট্রান্সভার্স বা আড়াআড়ি তরঙ্গের ক্ষেত্রে ঘটে যাতে স্পন্দন গতির দিকের সঙ্গে লম্ব হয়। এর থেকে বুঝা যায় আলো শব্দ তরঙ্গের মত সমদিক তরঙ্গ নয়, বরং পানির তরঙ্গের মত আড়াআড়ি তরঙ্গ।

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আলো রশ্মির বাঁকার পরিমাণটি তার তরঙ্গ-দৈর্ঘের উপর নির্ভর করে। সাধারণ সাদা আলোতে বিভিন্ন রকম তরঙ্গ-দৈর্ঘ এক সঙ্গে মেশানো থাকে। কিন্তু ত্রি-শিরা কাচ প্রিজম, কাচের উপর খুব কাছাকাছি অনেকগুলো কাটা জায়গা বা আঁচড় (যাকে ডিফ্র্যাকশন গ্রেটিং বলা হয়), বা কাছাকাছি অনেক ক্ষুদ্র জল

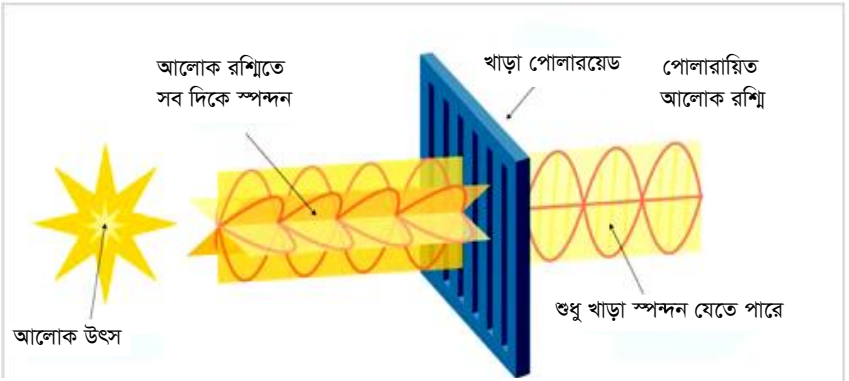

পোলারয়েড পাতের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে শুধু একই সমতলে স্পন্দিত হওয়া আলোক তরঙ্গ পাওয়া সম্ভব। এই আলো পোলারায়িত আলো। আলো আড়াআড়ি তরঙ্গ বলেই এটি সম্ভব।

বিন্দুর সমন্বয় (মেঘে যেমন হয়) ইত্যাদির মত পরিস্থিতিতে আলো বেঁকে গেলে তখন বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘের আলো বিভিন্ন পরিমাণে বেঁকে পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় চলে গিয়ে বর্ণালী সৃষ্টি করে। আলোর রঙ তরঙ্গ-দৈর্ঘের উপর নির্ভর করে বলে এর এক প্রান্তে সব চেয়ে কম তরঙ্গ-দৈর্ঘের দৃশ্যমান আলো বেগুনি থেকে অন্যপ্রান্তে সবচেয়ে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘের দৃশ্যমান আলো লাল পর্যন্ত বেনিআসহকলা নামক ক্রম অনুযায়ী বর্ণালী দেখা দেয়।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল

কয়েক শ' বছর আগেই বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন রেশমি কাপড় দিয়ে কাচের দণ্ড ঘষলে এবং আরো একটি কাচ দণ্ডকে একই ভাবে ঘষলে উভয় দণ্ড একটি অন্যটিকে বিকর্ষণ করে। আবার পশম দিয়ে একটি শক্ত রাবার দণ্ড ঘষলে সেই দণ্ডটি আগের কাচের দণ্ডটিকে আকর্ষণ করে। এ ঘর্ষণের পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ঘষার ফলে কাচের দন্ডটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ চার্জ পাচ্ছে, আর রাবারের দণ্ডটি ধনাত্মক বিদ্যুৎ চার্জ পাচ্ছে। একই রকম বিদ্যুৎ চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং ভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎ চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। পরে তাঁর প্রমাণ করেছেন সব পরমাণুতেই ঋণাত্মক কণিকা ইলেকট্রন থাকে এবং সমান ধনাত্মক অংশও থাকে। কোন কোন বস্তুর ইলেকট্রনগুলো সহজে খসিয়ে ফেলে অন্য বস্তুতে স্থানান্তর করা যায় যা উপরের ঘর্ষণ পরীক্ষায় বুঝা গেছে।

রবারের দণ্ড ঘষে তার কিছু ইলেকট্রন খাসানোর ফলে ওটি ধনাত্বক বিদ্যুৎ চার্জ যুক্ত হয়ে পড়েছিল। অন্য দিকে কাচের দণ্ড ঘষার সময় রেশম থেকে কিছু বাড়তি ইলেকট্রন কাচের দণ্ডে চলে আসাতে তা ঋণাত্বক বিদ্যুৎ চার্জযুক্ত হয়ে পড়েছিল। বিদ্যুৎ চার্জের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের যে বল তার একটি নিয়মও বিজ্ঞানীরা তখনই আবিষ্কার করেছিলেন:

$$\text{বিদ্যুৎ বল} = K \times \frac{\text{প্রথম বস্তুর চার্জ} \times \text{দ্বিতীয় বস্তুর চার্জ}}{(\text{দুই বস্তুর মধ্যে দূরত্ব})^2}$$

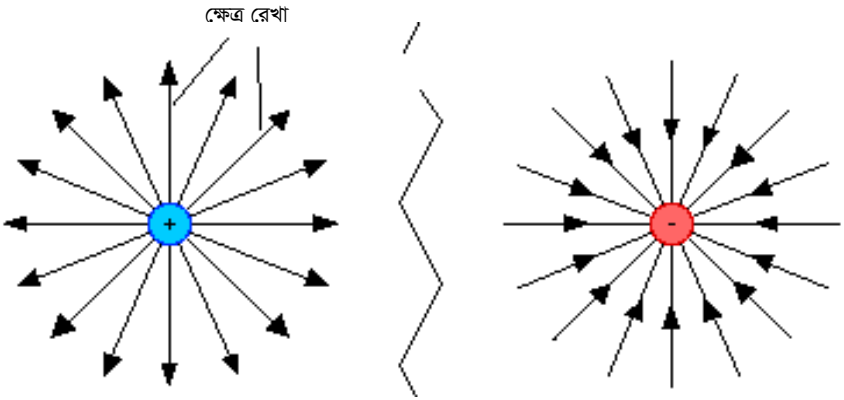

চার্জ মাত্রেরই রয়েছে চারিদিকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র

K একটি ধ্রুবক। একে কুলম্ব নিয়ম বলা হয় এবং স্পষ্টত নিয়মটির সঙ্গে মহাকর্ষ নিয়মের বেশ মিল আছে।

বহু কাল ধরে বিজ্ঞানীরা চুম্বকের মধ্যেও এরকম আকর্ষণ-বিকর্ষণের বল লক্ষ্য করে এসেছেন। এখানেও চৌম্বক বলের নিয়মটি কুলম্ব নিয়মের বা মহাকর্ষ নিয়মের প্রায় অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে আকর্ষণ ঘটে চুম্বকে উত্তর মেরচ ও দক্ষিণ মেরচ এই দুই ভিন্ন মেরচর ক্ষেত্রে এবং বিকর্ষণ ঘটে একই মেরচর ক্ষেত্রে। আর একটি পার্থক্য হলো আলাদা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ থাকতে পারলেও আলাদা কোন উত্তর মেরচ বা আলাদা দক্ষিণ মেরচ থাকতে পারেনা– সব সময় উত্তর ও দক্ষিণ মেরচ জোড়ায় জোড়ায় থাকতে হবে।

পরে দেখা গেল বৈদুতিক চার্জ যখন কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় (যেমন ধাতুর তারের) তখন যে প্রবাহ বা কারেন্ট তৈরি হয় তাও একটি চুম্বকের মত কাজ করে। আসলে চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক বল পরস্পর একই ঘটনা জাত এবং একটি সহজেই অন্যটি দিতে পারে। তাই আলাদা আলাদা ভাবে বিদ্যুৎ বল বা চৌম্বক বলের কথা না বলে আমরা বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের কথা বলতে পারি।

পরস্পর স্পর্শ না করেও দুটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল অথবা মহাকর্ষ বল দূর থেকেই কী ভাবে কাজ করে তা লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা বল-ক্ষেত্রের কথা কল্পনা করেছেন। এর মানে হলো এরকম বস্তু তার চারিদিকে একটি বিশেষ ক্ষেত্র তৈরি করে– বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, মহাকর্ষ ক্ষেত্র ইত্যাদি। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে থাকলে কোন চার্জ মাত্রই তার প্রভাব অনুভব করবে এবং ক্ষেত্রের দিক অনুসরণে পরিচালিত হবে– ক্ষেত্রের তীব্রতা ও নিজের চার্জের তীব্রতা, এবং ক্ষেত্রের মধ্যে নিজের অবস্থান অনুযায়ী। ক্ষেত্র যেন বিস্তৃত হয়ে আছে কিছু রেখার আকারে বা সূতার আকারে, যে সূতার টানে এসব ঘটে। আসলে পরে দেখা গেছে এসব রেখা বা সূতার কথা বাদ দিয়েই গাণিতিকভাবে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র, চৌম্বক ক্ষেত্র, মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র ইত্যাদিকে দেখা যায়।

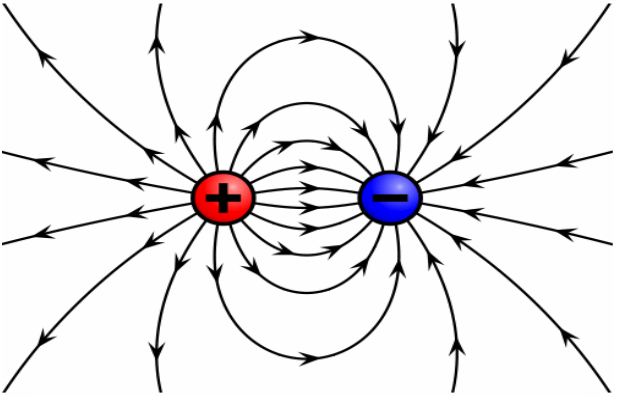

পাশাপাশি থাকা ধনাত্বক ও ঋণাত্বক বৈদ্যুতিক চার্জের (দ্বিপোল) সম্মিলিত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র।

একটি ভরযুক্ত বস্তু অন্য একটি বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের কোন অবস্থানে আছে তার দ্বারাই নির্ণিত হয় তার স্থৈতিকশক্তি (পোটেলশিয়াল এনার্জি)।

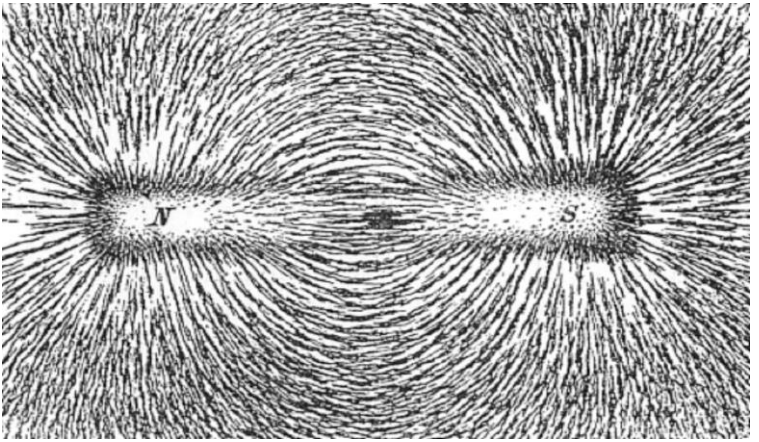

একটি চুম্বকের দুই মেরুর সম্মিলিত চৌম্বক ক্ষেত্র। লোহার গুড়ো ব্যবহার করায় চৌম্বক ক্ষেত্রটি চাক্ষুষ ফুটে উঠেছে। ক্ষেত্রটি বৈদ্যুতিক দ্বিপোলের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের অনুরূপ।

আমরা দেখেছি পৃথিবীর তলের যত উপরে কোন বস্তুকে রাখি তার স্থৈতিক শক্তি তত বেশি ঐ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের ঐ বিশেষ জায়গায় আছে বলে। ছেড়ে দিলে এটি গতিশক্তিতে পরিণত হয়। একই ভাবে একটি বিদ্যুৎ চার্জ অন্য চার্জের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের কোন জায়গায় আছে সেই অনুযায়ী তার মধ্যে স্থৈতিক শক্তি থাকে যা গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল নিয়ে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ

কুলম্বের নিয়ম আমরা দেখেছি। এর পর আম্পিয়ার, ফ্যারাডে প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব নিয়ে বেশ কিছু নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। এগুলো সবগুলোকে একত্র করে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল গাণিতিক ভাবে চারটি সমীকরণ দিয়েছেন যা বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্কগুলোকে খুবই সুন্দর, সংক্ষিপ্ত ও দিকদর্শিকা করে তোলে। ম্যাক্সওয়েলের প্রথম সমীকরণে দেখানো হয়েছে কীভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র এবং বিদ্যুৎ কারেন্ট সময়ের সঙ্গে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হারের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় সমীকরণে দেখানো হয়েছে কীভাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সময়ের সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তৃতীয় সমীকরণ দেখিয়েছে কী ভাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র চার্জের বন্টনের উপর নির্ভর করে– যে ভাবে মহাকর্ষের নিয়মে ভরের বন্টনের সঙ্গে (দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতে) মহাকর্ষ ক্ষেত্র সম্পর্কিত। চতুর্থ সমীকরণ এ রকম সম্পর্ক চৌম্বক ক্ষেত্রের বিষয়ে দেখিয়েছে; তবে এতে বুঝা যাচ্ছে যে শুধু উত্তর বা শুধু দক্ষিণ মেরচ একা থাকতে পারেনা।

ম্যাক্সওয়েলের চারটি সমীকরণের একটি ফলশ্রুতি হলো শূন্যস্থানের মধ্য দিয়েও বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্র পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করতে থাকবে। তার মানে স্পন্দনশীল একটি চৌম্বক ক্ষেত্র স্পন্দনশীল একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের জন্ম দেবে; আর একই ভাবে স্পন্দনশীল একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র স্পন্দনশীল একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্ম দেবে– এভাবে বার বার চলতেই থাকবে। স্পন্দন থেকে তরঙ্গ সৃষ্টির কায়দায় এই উভয়ে মিলে একটি তরঙ্গ সৃষ্টি করবে যা কিনা বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। ম্যাক্সওয়েল তাঁর সমীকরণগুলো থেকে এ তরঙ্গের গতিবেগটিও বের করলেন,

এবং অবাক হয়ে দেখলেন যে শূন্য স্থানের মধ্যে এই তরঙ্গের গতিবেগ হুবহু আলোর বেগের সমান।

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ অনুযায়ী (আসলে তাঁর পূর্বসূরী ফ্যারাডের আবিষ্কৃত নিয়ম অনুযায়ী) বাস্তব ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক জেনারেটর উদ্ভাবিত হয়েছে। এতে পরিবাহি বস্তুর (ধাতব তারের) এক বা একাধিক বার পাক খাওয়ানো লুপ বা রিং চৌম্বক ক্ষেত্রে মধ্যে ঘুরাতে থাকলে তার মধ্যে বৈদ্যুতিক কারেন্ট তৈরি হয়। যেহেতু প্রত্যেকবার ঘুরার সময় লুপটি একবার উল্টে যায় তাই এই কারেন্ট প্রতিবার

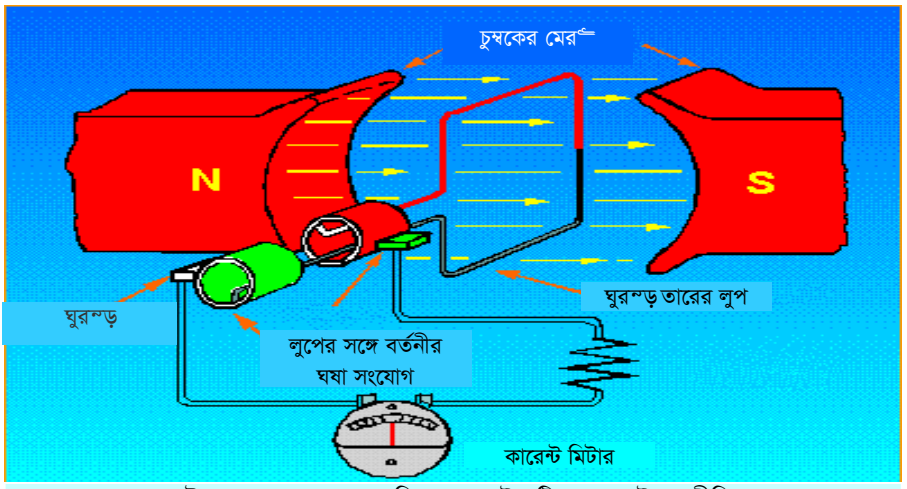

চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘুরন্ত লুপে বিদ্যুৎ কারেন্ট সৃষ্টি: জেনারেটরের নীতি

ঘুরার সময় প্রথমে বাড়ে, তারপর কমে, দিক পরিবর্তন করে, সেদিকে বাড়ে, সেদিকেও আবার কমে। এভাবে বার বার ঘুরার সঙ্গে সঙ্গে কারেন্টও বার বার উঠা, নামা, ও দিক পরিবর্তন করে। একে অল্টারনেটিং কারেন্ট বা এসি বলে। পুরো ব্যাপারটি উল্টো ভাবে ঘটে যখন এসি কারেন্টের প্রবাহ রয়েছে এমন লুপকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হয়। তখন এটি নিজে নিজেই ঘুরতে থাকে– যা বৈদ্যুতিক মোটরের মধ্যে ঘটে। বিশেষ ব্যবস্থায় অবশ্য এক- মুখি কারেন্টের জন্যও (ডিসি) জেনারেটর এবং মোটরের ব্যবস্থা করা যায়। এসি কারেন্ট স্পন্দনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের উৎস হতে পারে।

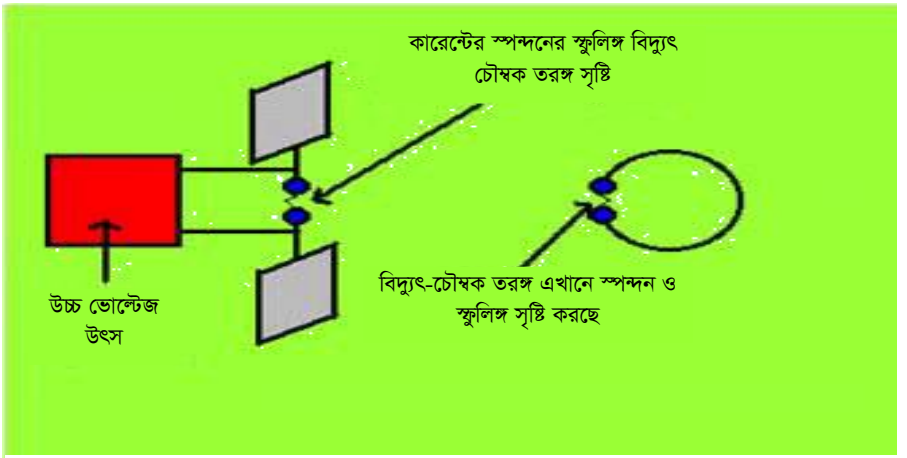

প্রথম যে ভাবে বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গের উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছিল

বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ

আমরা দেখেছি ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের একটি ফলশ্রুতি হিসেবে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের উপস্থিতি তাত্ত্বিক ভাবে স্পষ্ট হয়েছে, যার বেগ আলোর বেগের সমান। শিগ্‌গির বাস্তব পরীক্ষায়ও এটি প্রমাণিত হলো। এর বেগ আলোর বেগের সঙ্গে একই হওয়াটাও নেহাৎ কাকতালীয় হতে পারেনা; বরং দেখা গেল আলো নিজেও একটি বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। দৃশ্যমান এই আলো ছাড়াও তার থেকে বেশি বা কম তরঙ্গ-দৈর্ঘের আরো নানা রকম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ রয়েছে। বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ সীমার মধ্যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গগুলো আমাদের চোখে সাড়া দেয় বলে এগুলোকে আমরা দৃশ্যমান বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ (আলো) রূপে দেখি। এর থেকে কম তরঙ্গ-দৈর্ঘের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে আলট্রাভায়োলেট, এক্সরে, গামা রশ্মি ইত্যাদি, আবার এর চেয়ে অধিক তরঙ্গ-দৈর্ঘের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের মধ্যে রয়েছে ইনফ্রারেড, মাইক্রোওয়েভ, রেডিও তরঙ্গ ইত্যাদি। তরঙ্গ-দৈর্ঘের কারণে এদের প্রভাব আমাদের উপর ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে– যেমন আল্ট্রাভায়োলেট আমাদের চর্মে রঞ্জক বস্তু তৈরি করে, কোষ নষ্ট করে, এমন কি চর্মের ক্যানসার ঘটায়; ইনফ্রারেড তাপ-তরঙ্গ হিসেবে অনুভূত হয়; মাইক্রোওয়েভ খাবারের মধ্যে পানির অণুকে উত্তেজিত করে রান্না করার সুবিধা করে দেয়; ইত্যাদি। এগুলো

সবই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ যাতে গতির সঙ্গে লম্ব ভাবে থাকা বৈদ্যুতিক স্পন্দন ক্রমাগত একই ভাবে গতির সঙ্গে লম্ব ভাবে থাকা চৌম্বক স্পন্দনের জন্ম দিচ্ছে, এবং চৌম্বক স্পন্দন আবার বৈদ্যুতিক স্পন্দনের জন্ম দিচ্ছে, উভয়ের গড়া তরঙ্গ আলোর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এগুলোর জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয়না, কারণ যা এখানে স্পন্দিত হচ্ছে– সেই বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্র– তার জন্য কোন মাধ্যম প্রয়োজন হয়না।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের উৎস হিসেবে কাজ করার জন্য একটি বৈদ্যুতিক স্পন্দনের প্রয়োজন হবে। এটি হতে পারে একটি ইলেকট্রনের বারংবার এদিক ওদিক আসা-যাওয়া অর্থাৎ কিনা ইলেকট্রনের নিয়মিত পরিবর্তনশীল ত্বরণ প্রাপ্ত হওয়া, যা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। এমন ত্বরণের মধ্যে থাকা ইলেকট্রন একটি এসি কারেন্টের মতও বটে, কাজেই এর থেকে ক্রমাগত

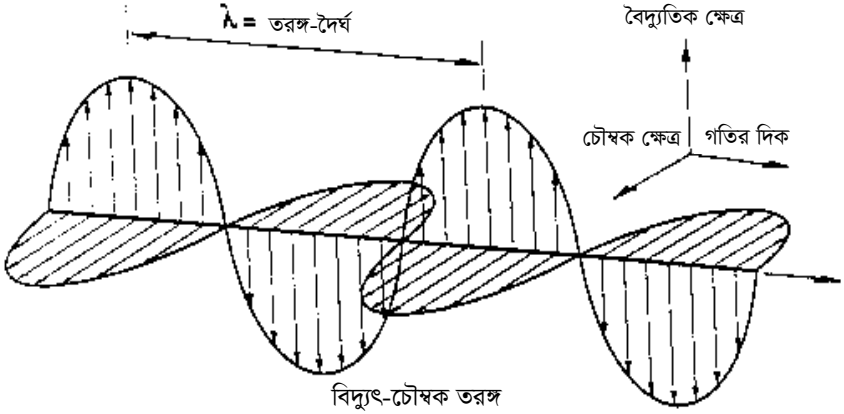

বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ

স্পন্দনশীল একটি চৌম্বক ক্ষেত্রও সৃষ্টি হবে। উভয়ে মিলে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এরকম বারংবার আসা যাওয়া ইলেকট্রন আমরা পরমাণুর মধ্যে পেতে পারি; যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সেটি সৃষ্টি করে তা হলো এক্সরে ইত্যাদি স্বল্প তরঙ্গ-দৈর্ঘের। অথবা এরকম আসা যাওয়া করা ইলেকট্রন আমরা সাধারণ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি বৈদ্যুতিক কারেন্ট এসি'র মধ্যে কিংবা রেডিও ব্রডকাষ্টে ব্যবহৃত ওসিলেটর বা স্পন্দক নামক ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার মধ্যে পেতে পারি; এগুলো যে

বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ তৈরি করে তা হলো বিভিন্ন রেডিও তরঙ্গের মত অপেক্ষাকৃত বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘের।

তরঙ্গ মাত্রই শক্তি বহন করে থাকে, যেমন খুবই উচ্চ মাত্রার আওয়াজে জানালার কাচ ভাঙ্গতে দেখেই আমরা সেটি বুঝি। বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গও শক্তি বহন করে– সেজন্য রেডিও তরঙ্গের আকারে সেটি আসলে তা আমাদের বেতার গ্রাহক যন্ত্রের এন্টেনায় দুর্বল বিদ্যুৎ-স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে, কিংবা আলো হিসেবে আসলে তা সৌর কোষে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি হালকা ওজনের ফুরফুরির মত চাকার উপর এসে পড়লে আলো সেই চাকাকে ঘুরাতেও পারে। ভরযুক্ত কোন বস্তু না হয়েও তরঙ্গ এমন শক্তি বহন করতে পারে কোন মাধ্যম ছাড়াই।

চিরায়ত বিজ্ঞানে কিছু সঙ্কট

নিউটনের সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরচ পর্যন্ত বিজ্ঞানের একটি চিরায়িত ভিত্তি খুবই সফল ও শক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে গিয়েছিল। পরম স্থান আর পরম কালের ধারণাটি এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উলেøখযোগ্য। এতে ধরে নেয়া হয়েছে যে স্থান আর কাল নিজের গুণেই স্বাধীনভাবে প্রকৃতির দুটি অমোঘ অস্থিত্ব হিসেবে বিরাজ করছে, এরা পরম ও অপরিবর্তনীয়। স্থানে বা কালে কী ঘটলো না ঘটলো, তাকে কে কোন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলো কি করলোনা এসবের উপর স্থান ও কাল মোটেই নির্ভর করছেনা। স্থান ও কাল বরং নানা ঘটনার একটি নির্লিপ্ত পটভূমি হিসেবে কাজ করে। তাই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গকেও যাতে এই পরম পটভূমিতে উপস্থাপন করা যেতে পারে সেজন্য এর মধ্যে শূন্যস্থান সহ সকল স্থান এক ধরনের অদ্ভূত তরলে ভর্তি এরকম মনে করা হতো, যার নাম দেয়া হয়েছিল ঈথার। কিন্তু এটি তরলরূপে কম্পিত হলেও আলোর মত অধিক ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ বহন করতে হলে এর দৃঢ়তা থাকা দরকার ছিল ইস্পাতের মত, অথচ এর ভর থাকতে পারবেনা, এর কোন চটচটে ভাবও থাকতে পারবেনা (ভিসকোসিটি)– নইলে গ্রহ-উপগ্রহের চলাচলে ঈথারের প্রভাব দেখা যেতো। আবার স্পষ্টত একে পূর্ণ স্বচ্ছও হতে হতো নইলে এর ভেতর দিয়ে আকাশের কিছু আমরা দেখতে পেতামনা। এরকম অদ্ভূত সব পরস্পর-বিরোধী গুণ সম্পন্ন বস্তুর কল্পনা ছাড়া পরম স্থান ও

পরম কালের ধারণাগুলোকে যৌক্তিক করা যাচ্ছিলনা। এটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে অনেক বিজ্ঞানীর যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অন্যদিকে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়মটি চিরায়ত বিজ্ঞানে একটি অনিবার্য নিয়ম। এই নিয়ম অনুযায়ী সব ক্রিয়ার মধ্যে এনট্রপি (বিশৃঙ্খলার পরিমাপ) সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেতে চায়। এই নিয়মের একটি ফলশ্রুতি হলো উত্তপ্ত একটি সিষ্টেমে শক্তি প্রকাশের যতগুলো কায়দা থাকতে পারে, সিষ্টেমের উত্তাপের উপর নির্ভরশীল একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সমান শক্তি তার প্রত্যেকটিতে থাকতে হবে। এই নীতিটিকে বলা হয় শক্তির সমবন্টন নীতি। কিন্তু পরে উত্তপ্ত গর্তের ভেতর থেকে যে বিকিরণ তরঙ্গ নির্গত হয় তার ক্ষেত্রে দেখা গেছে সমবন্টন নীতির ফলে এমন অসম্ভব ফলাফল পাওয়া যায় যা চিরায়ত পদার্থবিদ্যাকে প্রশ্নের সম্মূখীন করে। এই সব সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এমন নূতন কিছু ধারণা আনতে হয়েছে যা প্রকারান্তরে পদার্থবিদ্যায় বড় ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব

আলোর গতি একটি ধ্রুবক

উনবিংশ শতাব্দীর কিছু পরীক্ষা থেকে একটি অদ্ভূত ব্যাপার দেখা যাচ্ছিল যে আলোর গতি তার উৎসের বা গ্রাহকের গতির উপর মোটেই নির্ভর না করে সব সময় সমান থাকে। বিশেষ করে ১৮৮৭ সালে মাইকেলসন ও মর্লির এক্সপেরিমেন্ট নামে বিখ্যাত পরীক্ষায় তাঁরা সূক্ষ্মভাবে দেখার চেষ্টা করেছিলেন যে সূর্য-পরিক্রমণে পৃথিবীর গতির দিকে পাঠানো ও একই পথে ফেরৎ আনা আলো, আর এ গতির সঙ্গে লম্বভাবে পাঠানো আর সেই পথে ফেরৎ আনা আলোর, এই উভয়ের বেগে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কিনা। সর্বত্র বিস্তৃত কাল্পনিক ঈথার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যদি পৃথিবী এগুতে থাকে তা হলে সেই ঈথার পাড়ি দেয়া আলোর ক্ষেত্রেও পৃথিবীর গতির কারণে এই দুই পথে যাওয়া বেগের মধ্যে একটি পার্থক্য আসবে। পৃথিবীর গতির সঙ্গে লম্বভাবে পাঠানো ও ফেরৎ আনা আলোর একই দূরত্ব অতিক্রম করতে গতির দিকে আসা যাওয়া আলোর চেয়ে কিছুটা কম সময় লাগার কথা। কিন্তু খুউব সূক্ষ্ম পরিমাপেও সে রকম কোন পার্থক্য দেখা যায়নি।

এই ফলাফলের ব্যাখ্যা আইনষ্টাইন দিলেন তাঁর ১৯০৫ সালে দেয়া বৈপ্লবিক আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যে। প্রধানত দুটি ধারণার উপর তিনি এই তত্ত্বকে খাড়া করলেন। এর একটি হলো: সরল রেখায় সমগতিতে চলছে এমন যে কোন কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিত থেকে শূন্য স্থানের মধ্য দিয়ে আলোর বেগ সব ক্ষেত্রে একই। এরকম একটি কাঠামোকে পরিপ্রেক্ষিত কাঠামো (রেফারেন্স ফ্রেম) বলা হয়– মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষায় যেমন পৃথিবী নিজে একটি পরিপ্রেক্ষিত কাঠামো। আইনষ্টাইনের দ্বিতীয় ধারণাটি হলো সরল রেখায় সমবেগে চলছে এরকম সকল পরিপ্রেক্ষিত কাঠামোতে পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো সব সময় একই দেখা যাবে।

এই দুটি ধারণাকে যদি সত্যি হতে হয়, তা হলে কতগুলো বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেবার বিষয় অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে। সেগুলো চিরায়ত বিজ্ঞানের কিছু কিছু স্বীকৃত বিষয়কে ওলটপালট করে দিতে চায়। যেমন এর একটি হলো উৎসের যাই গতি

হোক না কেন, বা গন্তব্য স্থলের যা গতি হোক না কেন, আলোর বেগ তার কোনটির উপর নির্ভর না করে একই থাকবে। আর আলোর গতির থেকে দ্রুত চলে এমন কোন কিছুই থাকা সম্ভব নয়– না কোন বস্তু, না কোন তরঙ্গ, না অন্য কোন রকমের সিগ্‌ন্যাল।

একটি জিনিস লক্ষ্যনীয়– যে সবকিছু উপরে বলা হচ্ছে তার সবই সরল রেখায় সমগতিতে চলা পরিপ্রেক্ষিত কাঠামোর ক্ষেত্রে। এটি গতির একটি বিশেষ অবস্থা, তাই আইনষ্টাইনের এই তত্ত্বকে বলা হয় আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব। আইনষ্টাইন পরে আরো সাধারণ গতির ক্ষেত্রেও আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়েছেন যেখানে ত্বরিত হচ্ছে এমন পরিপ্রেক্ষিত কাঠামোর বিষয়ও বিবেচনা করা যাবে। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব নামের ঐ তত্ত্ব আমরা একটু পর দেখবো।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব তার অনিবার্য সিদ্ধান্ত হিসেবে যেমন আলোর বেগের ধ্রুবকতা ও তার অলঙ্ঘনীয়তাকে এনে দিয়েছে, তেমনি আরো কিছু অদ্ভূত বিষয় এনে দিয়েছে। সেগুলো এখন আমরা দেখবো।

সময়ের প্রসারণ, স্থানের সংকোচন, ভরের বৃদ্ধি

আলোর গতি ওভাবে উৎসের বা গ্রাহকের গতির উপর নির্ভর না করার একটি কারণ নিহিত রয়েছে সময় জিনিসটিই গতির উপর নির্ভর করে বলে। আইনষ্টাইনের তত্ত্বে দেখা গেল একটি ঘড়ির বেগ যত বাড়ে তার সময় তত স্লো হয়ে যায়। ঘড়ির বেগ আলোর বেগের যথেষ্ট কাছাকাছি যখন যায় এই স্লো হওয়ার বিষয়টিও তখন খুব প্রকট হয়। ঘড়িটি যে পরিপ্রেক্ষিত কাঠামোতে আছে সেখানকার কোন পর্যবেক্ষকের কাছে অবশ্য এটি স্লো হবেনা, কারণ তার কাছে ঘড়িটি স্থির। কিন্তু এর সঙ্গে আপেক্ষিক গতিতে আছে এমন কাঠামোর পর্যবেক্ষকের কাছে এটি স্লো হবে। এভাবে সময়ের প্রসারণ ঘটাটি আপেক্ষিক তত্ত্বের একটি অনিবার্য ফলাফল।

যে সব সাধারণ গতির সঙ্গে আমরা পরিচিত সেগুলোর বেগ আলোর তুলনায় এত কম যে তাতে সময়ের প্রসারণটি ধর্তব্যে আসেনা। কিন্তু মহাশূন্য থেকে আসা কসমিক রশ্মির মধ্যে থাকা দ্রুত গতি সম্পন্ন মিউয়ন কণিকার ক্ষেত্রে এই সময়ের

প্রসারণ বাস্তব পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো। খুব ক্ষণস্থায়ী এই কণিকাগুলো এসে যখন উচ্চ পর্বত শৃঙ্গে হাজির হয় তখনো তার গতি থাকে অত্যন্ত উচ্চ– আলোর গতির ৯৫% এর মত। কিন্তু ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষণে প্রায় স্থির অবস্থায় থাকা এই কণিকা পাওয়া যায়। দেখা যায় পর্বত শৃঙ্গে এটি যতক্ষণ টিকে, ল্যাবোরেটরিতে টিকে তার চেয়ে অনেক কম। উচ্চ বেগের কারণে সময়ের প্রসারণের নিয়মমত যত বেশি টেকার কথা ঠিক ঠিক তত খানিই এর আয়ুষ্কাল বেশি দেখা গেছে পর্বত শৃঙ্গে বেগবান মিউয়ন কণিকাগুলোর ক্ষেত্রে।

অন্য দিকে আপেক্ষিক সমগতিতে আছে এমন কাঠামোর পর্যবেক্ষকের কাছে কোন জিনিসের দৈর্ঘ তার বেগের সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে– জিনিসটির গতির দিকের দৈর্ঘ। একে বলা যায় গতির সঙ্গে স্থানের সঙ্কোচন। বেগ যত বেশি হবে সঙ্কোচন তত বেশি হবে, অবশ্য আলোর গতির কাছাকাছি আসলেই এমন সঙ্কোচন ধর্তব্যের মধ্যে আসে। আর একই কাঠামোতে থাকা পর্যবেক্ষকের কাছে কোন সঙ্কোচনই হবেনা, কারণ তার কাছে জিনিসটি স্থির।

আপেক্ষিক তত্ত্বে আরো দেখা গেল গতির সঙ্গে সঙ্গে কোন জিনিসের ভর বৃদ্ধি পায়। আলোর গতির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলে ভর খুবই বেশি বৃদ্ধি পায়, আর আলোর আরো গতির সমান গতিতে পৌঁছলে সেটি অসীম ভরে পরিণত হয়। যত বেশি বলই কল্পনা করা হোক না কেন অসীম ভরের কোন জিনিসকে ত্বরণ দেয়া অর্থাৎ তার গতি বাড়ানো সম্ভব নয়। এই কারণেই আলোর গতিতে পৌঁছানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই যে ভরের বৃদ্ধি একে দেখা যায় গতিশক্তির বাড়তি ভরে পরিণত হওয়া হিসেবে। তার মানে শক্তি আর ভর একই জিনিস, তার একটি অন্যটিতে পরিণত হতে পারে। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে শক্তি ও ভরের সমতার সমীকরণটি সব চেয়ে বেশি খ্যাতি পেয়েছে:

$$E = mc^2$$

অর্থাৎ, শক্তি = ভর × (আলোর বেগ)^২

পরে নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যবহার এবং বহু রকম পরম কণিকার পরীক্ষণে শক্তি ও ভরের এই সমতা ও পরস্পর অদল বদলের বাস্তব প্রমাণ নিয়মিত মিলেছে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে গতির ফলে এই যে বাড়তি ভর সেটি একটি বিশেষ রকমের

শক্তি-সদৃশ ভর, যাকে আপেক্ষিক তত্ত্বীয় ভরও বলা যায়। স্থির থাকা কালীন যে মূল ভর, যাকে স্থির-ভরও বলা হয়, সেটি কিন্তু কোন বস্তু বা কণিকার অন্তর্নিহিত ভর যা অপরিবর্তনীয়।

একই সঙ্গে ঘটা কথাটির মানে কী?

দুটি ঘটনা একই সঙ্গে ঘটার মানে আমরা ঠিকই বুঝি– যেমন একই সঙ্গে দুটি জিনিসকে মাটিতে পড়তে দেখলাম। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী এই এক সঙ্গে ঘটার ধারণাটি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। একই পরিপ্রেক্ষিত কাঠামোর নানা পর্যবেক্ষকের সবার কাছে দুটি ঘটনা একই সঙ্গে ঘটছে মনে হতে পারে। কিন্তু পরস্পর আপেক্ষিক সমগতিতে রয়েছে এমন নানা পর্যবেক্ষকের কারো কাছে 'ক' ও 'খ' দুটি ঘটনা এক সঙ্গে ঘটছে মনে হলে অন্য কারো কাছে 'ক' আগে ঘটেছে মনে হতে পারে। আবার অন্য কোন কাঠামোতে অন্য পর্যবেক্ষকের কাছে 'খ' আগে ঘটেছে মনে হতে পারে। সবই নির্ভর করবে উভয়ের আপেক্ষিক গতি এবং ঘটনা দুটার মধ্যে দূরত্বের উপর। এই ব্যাপারটির তাৎপর্য কিন্তু অনেক। কারণ দুটি ঘটনার একটিকে যদি কারণ ও অন্যটিকে যদি তার কার্য হিসেবে বিবেচনা করতে হয় তাহলে কারণকে অবশ্যই কার্যের আগে ঘটতে হবে, কোন অবস্থাতেই কার্যের পরে কারণ ঘটতে পারে না। কিন্তু কোনটি আগে কোনটি পরে ঘটছে সে ব্যাপারে যদি সব কাঠামোর সবার মতক্যে না থাকে তা হলে কার্যকারণ সম্পর্কে

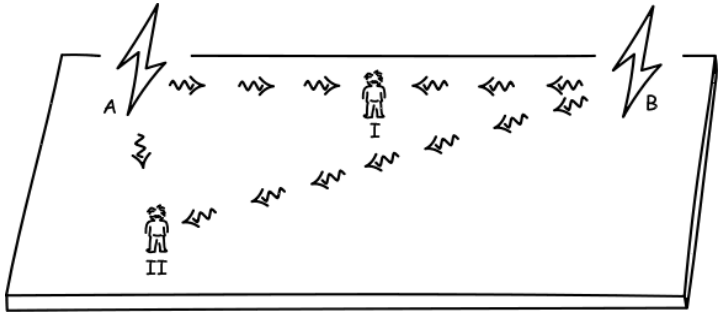

এক সঙ্গে ঘটার ব্যাপারটি পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক। I অবস্থানে থাকা পর্যবেক্ষকের কাছে A ও B দুটি বিদ্যুৎ-চমক এক সঙ্গে ঘটেছে। কিন্তু II অবস্থানে থাকা পর্যবেক্ষকের কাছে A আগে ঘটেছে। অবশ্য আলোর গতির তুলনায় পর্যবেক্ষকের দূরত্ব-গুলো যথেষ্ট না হলে এই পার্থক্যটি ধর্তব্যের মধ্যে হবে না।

সমস্যা দেখা দেয়। যেমন একটি ঘটনাকে যদি দূরে কোথাও আর একটি ঘটনার কারণ হতে হয় তা হলে দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সময়কে ঐ দূরত্ব অতিক্রম করতে আলোর প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে দীর্ঘতর অথবা অন্তত সমান হতে হবে। এভাবে আপেক্ষিক তত্ত্বের কারণে কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে আমাদের এতদিনের ধারণা অনেক ক্ষেত্রে আমরা বদলাতে বাধ্য হচ্ছি।

স্থান ও কাল

আপেক্ষিক তত্ত্ব স্থান ও কাল সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বহুদিনের ধারণা একেবারে পালটিয়ে দিয়েছে। গতির সঙ্গে সময়ের প্রসারণ এবং দৈর্ঘের সংকোচন কালের ও স্থানের মাধ্য আপেক্ষিকতা এনে দিয়ে পরম কাল ও পরম স্থানের ধারণার অবসান ঘটিয়েছে। মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষা ধরে নিয়েছিল সর্বব্যপ্ত ঈথারের মধ্য দিয়ে পৃথিবী সাঁতার কেটে যাচ্ছে যার ফলে আলোক তরঙ্গের বেগ পৃথিবীর গতির দিকে এক রকম তার সঙ্গে লম্ব ভাবে অন্য রকম হবে। এমনটি প্রমাণে এ পরীক্ষা যখন ব্যর্থ হয়েছে তখনই ঈথারের কল্পনাটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব কিন্তু এখানেই থামেনি।

আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে এসে যে ভাবে একই সঙ্গে স্থান সঙ্কুচিত হয় এবং কাল প্রসারিত হয় তাতে দেখা যায় যে স্থান ও কালের পরিবর্তন পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। একের পরিবর্তনকে অন্যের পরিবর্তন দিয়ে বদল করা যায়– শুধু দৃষ্টিকোণ বদলিয়ে। এতদিন পর্যন্ত স্থানের তিনটি মাত্রা (দৈর্ঘ-প্রস্থ-উচ্চতার মত) এবং কালের একটি মাত্রার মধ্যে কোন সম্পর্ক রয়েছে এমন কথা আমাদের মনে হয়নি; কোন ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আমরা আলাদা ভাবে ডানে-বামে, সামনে-পেছনে, উপর-নিচে তার অবস্থান নিয়ে তার স্থানিক তিনটি তথ্য দিতাম, আর কালের একটি তথ্য দিয়ে কখন সেটি ঘটেছে সেটি জানাতাম আলাদা ভাবে। আপেক্ষিক তত্ত্বে স্থান ও কাল মিশে গিয়ে স্থান-কালের চার মাত্রা একই পর্যায়েই চলে এসেছে। তাই মহাবিশ্বকে এখন চারমাত্রার স্থান-কালে গড়া সত্ত্বা বলেই ধরে নিতে হচ্ছে। এর তাৎপর্য অনেক; এই একীভূত সত্ত্বার গাণিতিক

রূপ এখন ভিন্ন ভাবে দেখতে হচ্ছে, স্থান ও কাল নিয়ে মানুষের দর্শন ও বিশ্ব-দৃষ্টিতেও এটি একটি অত্যন্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে আইনাষ্টাইন দেখিয়েছেন যে যেসব পরিপ্রেক্ষিত কাঠামো ত্বরণ লাভ করছেনা, বরং সরল রেখায় সমবেগে রয়েছে তার সবগুলোতে পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো একই থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই আইনষ্টাইনসহ সকল বিজ্ঞানীরা দেখতে চেয়েছেন সকল পরিপ্রেক্ষিত কাঠামোর জন্যই যেন পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো একই থাকে– তা সেগুলো সমবেগেই থাকুক তার ত্বরণের মধ্যেই থাকুক। এটি প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা হিসেবেই আইনষ্টাইন অপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন।

এই তত্ত্ব মহাকর্ষ এবং যে কোন ত্বরণের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ সমতার সৃষ্টি করেছে। এতে যা মহাকর্ষ তাই ত্বরণ, দুইয়ের মধ্যে তফাৎ করার উপায় নেই। সচরাচর

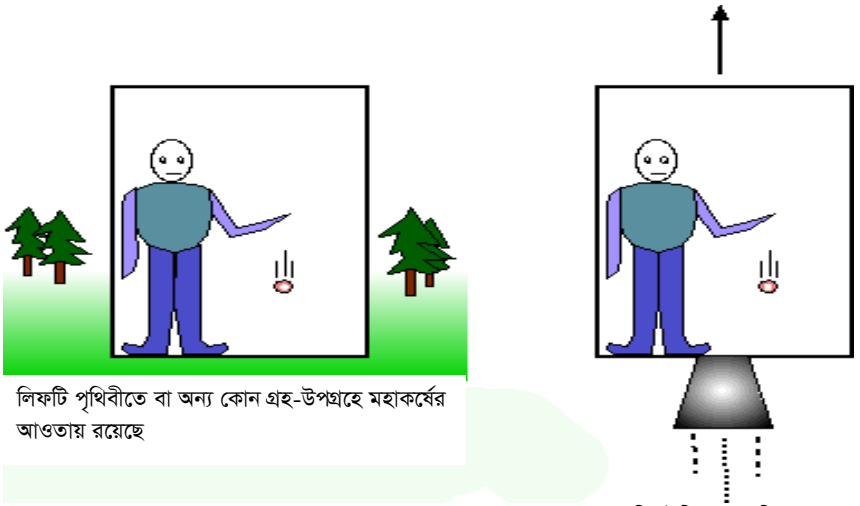

লিফটি পৃথিবীতে বা অন্য কোন গ্রহ-উপগ্রহে মহাকর্ষের আওতায় রয়েছে

লিফ্টটি ছাদের দিকে ত্বরিত হচ্ছে

লিফটির ভেতর সব ঘটনা উভয় ক্ষেত্রে একই রকম হবে।

জীবনেও আমরা এই সমতা কিছুটা বুঝতে পারি। আমরা যখন একটি লিফ্টের মধ্যে থাকি এবং সেটি দ্রুত উপরের দিকে ত্বরণ লাভ করে তখন আমরা নিজেদেরকে অনেক বেশি ভারি বলে অনুভব করি - যেন হঠাৎ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বেড়ে গেছে। আসলে একটি বদ্ধ লিফ্টে যদি আমরা মহাবিশ্বের কোন এক জায়গায় থাকি আর ভেতরে সব কিছুকে লিফটের মেঝের দিকে পড়তে দেখি, তখন এই পড়ার আসল কারণটি বুঝতে পারবোনা। বলতে পারবোনা আমরা কি মহাশূন্যে রয়েছি যেখানে লিফট তার ছাদের দিকে ত্বরিত হচ্ছে, নাকি কোন গ্রহ বা উপগ্রহের মাটির উপর লিফ্টি স্থির আছে– তার মহাকর্ষেই সব জিনিস নিচের দিকে পড়েছে। এর অর্থ মহাকর্ষ আর ত্বরণ একেবারে একই জিনিস। এখন তাহলে বস্তুর ত্বরণের দ্বারা সৃষ্ট ফলাফলকে বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের ফলাফল হিসেবেই গ্রহণ করা যায়।

এর একটি দুর্দান্ত ফলশ্রুতিকে একটি উপমার মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করা হোক। বিনোদন পার্কে এক ধরনের রাইড আছে (টর্নাডো রাইড) যেখানে সিলিণ্ডার আকৃতির একটি চক্রে সবাই চেয়ারে বসে আর এর অক্ষের চারিদিকে এটি বনবন করে ঘুরতে থাকে। মনে করা যাক এর মধ্যে থাকা এক ব্যক্তি অক্ষের কাছে থেকে একটি রচ্লার দিয়ে চক্রটির কিনারার পরিধি মাপার চেষ্টা করছেন। যেহেতু তিনি যেখানে আছেন তার তুলনায় কিনারায় থাকা রচ্লারটি বেশি জোরে ঘুরছে কাজেই রচ্লারটি আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী খানিকটা বেঁটে হয়ে যাওয়ার কথা। তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে (যদিও আমরা একটু বাড়িয়ে বলছি, কারণ ঐ অল্প গতিতে বেঁটে হওয়াটা বুঝতে পারার কথা নয়)। ফলে আসলে পরিধিটি যত এই রচ্লার দিয়ে মাপলে তার চেয়ে একটু বেশি পাওয়া যাবে। এখন যদি ঐ ব্যক্তি চক্রটির ব্যাসার্দ্ধ নির্ণয় করেন অক্ষ থেকে পরিধির দিকে মেপে গিয়ে, তা হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু রচ্লারের দৈর্ঘের কোন পরিবর্তন হবেনা, কারণ ব্যাসার্দ্ধের দিকে কোন গতি নেই। জ্যামিতিতে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের একটি সুনির্দিষ্ট অনুপাত আছে যাকে গ্রীক অক্ষর 'পাই' বলা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিধিটি অস্বাভাবিক রকম বড় পাচ্ছি বলে সেই জ্যামিতি আর খাটবেনা। পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত এখানে 'পাই' এর চেয়ে বেশি হওয়াতে মনে হবার কারণ ঘটে যে ওখানকার স্থানটি একটু বিকৃত বা বাঁকা হয়ে গেছে। সমতলে জ্যামিতিক বৃত্ত আঁকলে যেমন হয় তেমনটি আর নেই।

বাঁকানো তলের উপর বৃত্ত ইত্যাদি আঁকলে যেমন আমরা দেখবো সেই রকম বিকৃত হওয়া বৃত্ত দেখবো। এখানে সাধারণ জ্যামিতির নিয়ম খাটছেনা। সেভাবে কল্পনা করতে পারি বাঁকানো স্থানের মধ্যে কিউব, গোলক ইত্যাদি তৈরি করলে দেখবো সেখানেও সাধারণ জ্যামিতি খাটছেনা। সাধারণ জ্যামিতির ব্যত্যয় দেখে বুঝবো সেখানে স্থান বক্র। মনে রাখতে হবে যে উপরের ব্যাপারটি ঘটছে ত্বরণ রয়েছে এমন ব্যবস্থায়– ঘূর্ণনের ফলে কেন্দ্রমুখি ত্বরণটির কথা আমাদের মনে রয়েছে। আসলে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব সাধারণভাবেও দেখিয়েছে যে যেখানে ত্বরণ রয়েছে সেখানে স্থানে এক রকম বক্রতা সৃষ্টি হয়। আর যেহেতু ত্বরণ আর মহাকর্ষ একই জিনিস বলে আমরা দেখলাম, একে মহাকর্ষের ফলে স্থানের বক্রতা বলেও বিবেচনা করা যায়।

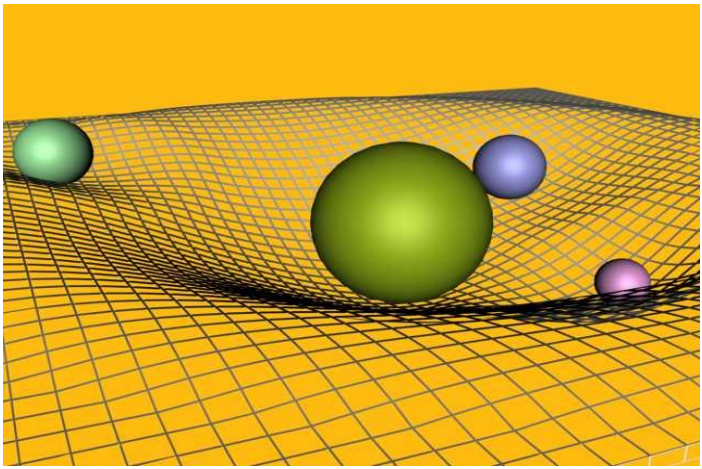

একটি ভারি গোলক ভরের কারণে সমতল রাবার শীটে বক্রতা বা বিকৃতি সৃষ্টি করছে। কম ভারি গোলক কম বক্রতা সৃষ্টি করছে। বক্রতাগুলোর কারণে এগুলো পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। একে স্থানা কালের বক্রতার ফলে মহাকর্ষের উপমা হিসেবে নেয়া যায়।

দেখা গেল ভর সম্পন্ন বস্তু মাত্রই এভাবে তার আশপাশের স্থানকে বিশেষ আকৃতিতে বাঁকিয়ে ফেলে– ভর যত বেশি, এই বক্রতার পরিমাণও তত বেশি। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে মহাকর্ষ বলতে এটিই বুঝায়। নিউটন যেখানে বলতেন এক বস্তু অন্য বস্তুকে দূর থেকে আকর্ষণ করে, আইনষ্টাইন সেখানে

বলেøন বস্তুর ভরের ফলে তার চারিদিকে স্থান বক্রতা লাভ করে বলে অন্য বস্তু সেই বক্রতা অনুসরণ করে প্রথম বস্তুর কাছে যায়, যাকে আমরা মহাকর্ষ বলি। এর ফলে দূর থেকে তাৎক্ষণিক আকর্ষণের নিউটনীয় ধারণায় যে সমস্যা ছিল তাও দূর হয়ে গেল। কেউ যে টানছে অন্য বস্তুটি তাৎক্ষণিক ভাবে সেটি বুঝে কী করে– সেটিই ছিল সমস্যাটি। শুধু তাই নয় মহাবিশ্বের সব বস্তুর বন্টনের উপর নির্ভর করে এর পুরো স্থান-কালের বক্রতা নিয়েও আইনষ্টাইন হিসেব কষতে পারলেন – যার থেকে বিজ্ঞানীরা দেখার চেষ্টা করছেন মহাবিশ্বটি কি গোলকাকৃতি, না অধিবৃত্তাকৃতি, না সমতল ইত্যাদি, অর্থাৎ কিনা এটি কি বদ্ধ ও সসীম, না উন্মুক্ত ও অসীম।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অত্যন্ত গণিত-নির্ভর তাত্ত্বিক একটি প্রকল্প হিসেবেই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অল্প কয়েক বছরের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যার জগতে তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন দূর তারা থেকে আলো পৃথিবীতে আসার সময় সূর্যের কাছ ঘেঁষে আসতে হয়। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের হিসেব মত সূর্যের ভরের প্রভাবে স্থান-কালের বক্রতার কারণে এই আলোটি অতি সামান্য

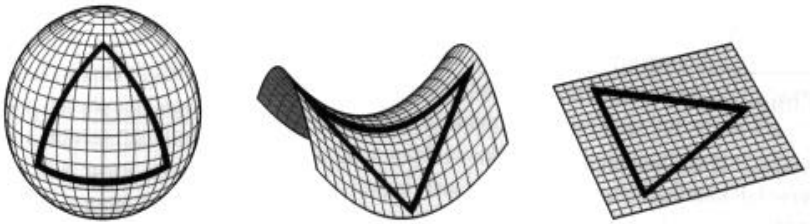

এখানে দ্বিমাত্রিক তলকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, চতুর্মাত্রিক পরিস্থিতি সহজে কল্পনা করা যায়না বলে। কিন্তু চতুর্মাত্রিক ক্ষেত্রেও একই ধরনের বক্রতা সম্ভব।

কিছুটা বেঁকে যাওয়ার কথা। সূর্য- গ্রহণের সময় সূর্যের আলো না থাকায় এই বাঁকার পরিমাণটি মাপা সম্ভব হয়েছে এবং হুবহু সাধারণ তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীই তা পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও বুধ গ্রহের অস্বাভাবিক গতিবিধি সহ জ্যোতির্বিদ্যার এমন কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা এতে সম্ভব হয়েছে যা নিউটনের মহাকর্ষ

তত্ত্বে দেয়া যাচ্ছিল না। এর অর্থ এই নয় যে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব কাজে লাগবেনা। আসলে এই উভয় তত্ত্বের বাস্তব ফলাফলে পার্থক্য অতি সামান্য এবং তা শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গুরচত্ব বহন করে। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্বে মহাকর্ষের ব্যাখ্যা তাত্ত্বিক দিক থেকে অনেক বেশি সন্তোষজনক এবং তা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। আপেক্ষিকতার বিশেষ ও সাধারণ তত্ত্বের ধারণাগুলো আমাদের সাধারণ জ্ঞানের দিক থেকে তো বটেই, চিরায়ত পদার্থবিদ্যার দিক থেকেও অত্যন্ত বৈপ্লবিক।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব

শক্তির কোয়ন্টাম

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে শক্তি বিকিরণ সম্পর্কিত একটি সমস্যা পদার্থবিদদের খুব ভাবিয়ে তুলেছিল। বাইরের জগতের দ্বারা প্রভাবিত হয়না এমন একটি গর্তের মত (ক্যাভিটি) জায়গাকে যদি বিশেষ কোন উত্তাপে রাখা হয় তাহলে তার ভেতর বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। বুঝার সুবিধার জন্য আমরা একটি উত্তপ্ত ওভেন চুলাকেও এরকম একটি জায়গা হিসেবে ধরে নিতে পারি। এখানকার উত্তাপে থাকা চার্জযুক্ত কণিকাগুলোর কম্পনের (ত্বরণের) ফলে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ অনুযায়ীই এইসব বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সৃষ্টি। এদের প্রত্যেকটি আবার ওভেনটির সব দিকের দেয়ালে পড়ে সেখানে শোষিত হয়, আবার ভিন্ন কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে পুনর্নির্গত হয়। এভাবে ক্রমাগত চলতে থাকে আর অসংখ্য নানা ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি হতেই থাকে। এদের মধ্যে যে সবের তরঙ্গ-দৈর্ঘ এমন যে বিপরীত দুটি দেয়ালের মাঝে পূর্ণ সংখ্যক তরঙ্গ হুবহু ফিট করে যায় সেগুলো বিকীর্ণ হবার মত শক্তি তরঙ্গ হিসেবে গ্রাহ্য হয়। এরকম গ্রাহ্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ অর্থাৎ গ্রাহ্য ফ্রিকোয়েন্সির সংখ্যাও কিন্তু অসীম। আমরা দেখেছি তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়মের সূত্র ধরে এরকম প্রত্যেকটি ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সব ক্ষেত্রে সমান একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি যা নির্ভর করে শুধু ঐ ওভেনের উত্তাপের উপর। বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি মানে শক্তি বন্টিত হবার সম্ভাব্য বিভিন্ন কায়দা বলেই এমনটি ঘটে। কাজেই অসীম সংখ্যক ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গের মোট শক্তিও অসীম হতে বাধ্য। বিজ্ঞানীরা তাদের কোন ফলাফলে অসীম কিছু হতে দেখলে বুঝে যান যে তত্ত্বে কোথাও সমস্যা আছে, একে তাঁরা একটি সংকট হিসেবেই দেখেন। তাপগতিবিদ্যার মত বিষয়গুলো বিজ্ঞানে এতো বেশি মৌলিক ভাবে গুরচত্বপূর্ণ যে সেখানে নয় বরং অন্যত্র খুঁজতে হলো সেই সমস্যার সমাধান।

সমাধানটি এলো ১৯০০ সালে ম্যাক্স পøাঙ্কের দেয়া এক যুগান্তকারী তত্ত্বের মাধ্যমে যার নাম কোয়ান্টাম তত্ত্ব। এত দিন শক্তিকে নিরবিচ্ছিন্ন একটি সত্ত্বা

হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু প্ল্যাঙ্ক ধরে নিলেন শক্তি সে রকম নয়, বরং এটি গুচ্ছে গুচ্ছে এক একটি বান্ডিল রূপে নির্গত হয়। এই এক একটি বান্ডিলকে বলা হলো এক একটি কোয়ান্টাম। শক্তি বিকিরণে তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি হবে (অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ যত কম হবে) তার কোয়ান্টামের শক্তির পরিমাণ তত বেশি হবে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী কোয়ান্টামের শক্তি ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে সমানুপাতিক:

$$\text{কোয়ান্টামের শক্তি} = h \times \text{ফ্রিকোয়েন্সি}$$

এখানে সমানুপাতের ধ্রুবক h কে বলা হয় প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। এর মানটি কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র। $h = ৬.৬৩ \times ১০^{-৩৪}$ জুল সেকেন্ড । h এর এই অতি ক্ষুদ্র মান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে কোয়ান্টামের শক্তির পরিমাণ অত্যন্ত কম; আর এই কারণেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাপারগুলো শুধু অণু-পরমাণুর জগতেই বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠে।

আমাদের ঐ উত্তপ্ত ওভেনের মোট শক্তি অসীম হয়ে পড়ার যে সঙ্কট সেটির সমাধান কিন্তু প্ল্যাঙ্কের এই নূতন ধারণার মাধ্যমেই হয়ে গেল। ওভেনের মধ্যে যে সব তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি কম তার কোয়ান্টামের শক্তিও সেই অনুযায়ী কম। প্রত্যেক ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে ওভেনের উত্তাপ দ্বারা নির্ধারিত সবার জন্য প্রযোজ্য সেই বন্টিত শক্তির পরিমাণের সমান হতে যে ক'টি কোয়ান্টাম প্রয়োজন হবে সে ক'টির দ্বারাই সেই প্রয়োজন মেটানো হয়। ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি হবে অর্থাৎ কোয়ান্টামের শক্তি যত বেশি হবে, অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক কোয়ান্টাম এ কাজে লাগবে। কিন্তু কোন তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি যদি এত বেশি হয় যে তার কোয়ান্টামের শক্তি ঐ নির্ধারিত শক্তির চেয়ে বেশি তা হলে ঐ কোয়ান্টাম আর শক্তি বিকিরণে অবদান রাখতে পারেনা। তাই মোট শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করতে এর উপরের কোন ফ্রিকোয়েন্সিই হিসাবের মধ্যে আসবেনা। ফলে অসীম হবার কোন আশঙ্কাই থাকছেনা।

একটি উপমা হিসেবে বলতে গেলে এ যেন ওভেনের ২০ ডিগ্রি উত্তাপ (উদাহরণ স্বরূপ) ঠিক করে দিয়েছে যে প্রত্যেক ফ্রিকোয়েন্সির মূল্য হতে হবে ২০ টাকা। এখন ধরা যাক একটি ফ্রিকোয়েন্সির কোয়ান্টাম যেন এক টাকার নোট। ২০টি

এক টাকার নোট দিয়ে তার দাম দেয়া যায়। আবার তার দ্বিগুণ ফ্রিকোয়েন্সির কোয়ান্টাম দুই টাকার নোট। তার ক্ষেত্রে লাগবে ১০টি কোয়ান্টাম। যেটির কোয়ান্টাম পাঁচ টাকার নোট তার জন্য ৪টি কোয়ান্টাম, আর যেটির কোয়ান্টাম ১০ টাকার নোট তার চাই মাত্র ২টি নোট। ২০ টাকার নোট ১টি দিয়েও মূল্য শোধ করা যাবে, কিন্তু ৫০ টাকার নোট দিয়ে মূল্য শোধ করা যাবে না কারণ মূল্যের বেশি দেবার এখতিয়ার নেই। সে ক্ষেত্রে ২০ টাকা মূল্যের কোয়ান্টাম যে ফ্রিকোয়েন্সির তার উপরের কোন কোয়ান্টাম ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া কোয়ান্টাম তত্ত্ব হলো গোটা গোটা কোয়ান্টামের (আমাদের উপমাতে নোট) ব্যাপার, এখানে ভাংতির কোন কারবার নেই। চিরায়ত পদার্থবিদ্যার একটি বড় সঙ্কট এভাবে এড়ানো সম্ভব হলো। শক্তিকে নিরবিচ্ছিন্ন জিনিস হিসেবে না দেখে টুকরো টুকরো বা কোয়ান্টাম হিসেবে দেখতে শেখার মাধ্যমেই এটি সম্ভব হলো।

আলোর কণিকা রূপ

একটি তাত্ত্বিক সঙ্কটের সমাধানের জন্য কোয়ান্টাম তত্ত্ব এলো বটে, কিন্তু এই তত্ত্বের পরবর্তী উন্নয়ন ও তাৎপর্য হলো অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী– যা বিজ্ঞানের চেহারা একেবারে পালটিয়ে দিলো, এর দার্শনিক উপলব্ধিটিও। এই তাৎপর্য সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন আইনষ্টাইন ১৯০৫ সালে। শক্তি কোয়ান্টাম বা বান্ডিলের আকারে নির্গত হয় এমন কথা বলে প্ল্যাঙ্ক নিজেই শক্তির একটি কণিকা রূপের উন্মোচন করেছিলেন। এই ব্যাপারটিকে আইনষ্টাইন কাজে লাগালেন ফটো-ইলেকট্রিক প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে। তিনি দেখালেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী আলো নির্গত হয় কণিকারূপে– যে কণিকার নাম দেয়া হলো ফোটন। ফটো-ইলেকট্রিক প্রক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছিল যে কোন ধাতুর উপর আলো ফেল্‌লে কিছু ইলেকট্রন ধাতুর গা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়, যাদেরকে একটি ধনাত্মক ইলেকট্রোডে আকর্ষণ করে সংগ্রহ ও পরিমাপ করা যায়। আইনষ্টাইন দেখালেন উজ্জ্বলতর আলো ফেল্‌লে এরকম উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ে বটে কিন্তু এদের শক্তি বাড়েনা। শক্তি বাড়াতে হলে অধিক ফ্রিকোয়েন্সির আলো ফেলতে হয়। ব্যাপারটিকে তিনি কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা করতে পারলেন, কারণ

অধিক ফ্রিকোয়েন্সির আলোর কোয়ান্টাম বা ফোটনের রয়েছে অধিকতর শক্তি যা এক একটি ইলেকট্রনকে অধিকতর শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত করতে পারছে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব ছাড়া এই ব্যাপারটিকে অন্য কোন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না বলে এখানে কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি প্রমাণ মিললো বাস্তব পরীক্ষায়। এভাবে দেখা গেল যে আলো বা অন্য যে কোন বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ একই সঙ্গে তরঙ্গ এবং কণিকা। একই সঙ্গে তরঙ্গ ও কণিকা হওয়ার ব্যাপারটি যতই অদ্ভূত মনে হোক একে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় রইলোনা। তরঙ্গ না হলে এর ইন্টারফেরেন্স বা ডিফ্রাকশনের মতো গুণ থাকবে কেন, আর কণিকা না হলে এর ফটো-ইলেকট্রিক প্রক্রিয়া থাকবে কেন।

আলোক কণিকার স্থির-ভর অবশ্য শূন্য। এটি ভরহীন কণিকা – যদিও ভর-বেগহীন নয়। অন্তর্নিহিতভাবে ভরহীন বলেই আলোর গতিতে চলা এর পক্ষে সম্ভব, আপেক্ষিকতার বিশেষ নিয়ম সত্ত্বেও।

বস্তুর তরঙ্গ রূপ

উল্টো দিক থেকে ভেবে এও স্বাভাবিক ভাবেই মনে করা যায় যে তরঙ্গ যদি কণিকা হতে পারে, তবে কণিকা কেন তরঙ্গ হতে পারবেনা। ঠিক এই চিন্তাকে তাত্ত্বিক রূপ দিলেন লুই দ্য ব্রগলি ১৯২৪ সালে। তিনি শুধু কণিকাকে তরঙ্গ হিসেবে কল্পনাই করলেন না, সেই বস্তু-তরঙ্গের তরঙ্গ- দৈর্ঘ কত হবে তারও তত্ত্ব দিলেন:

$$\text{তরঙ্গ-দৈর্ঘ} = \frac{h}{\text{কণিকার ভরবেগ}}$$

এই ব্যাপারটিও যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাপারে তা h এর উপস্থিতি থেকেই বুঝা যাচ্ছে। h যেহেতু অতি ক্ষুদ্র তাই উপরের সমীকরণ অনুযায়ী ধর্তব্যে আনার মত তরঙ্গ-দৈর্ঘ পাওয়া যাবে শুধু ক্ষুদ্র কণিকার ক্ষেত্রেই যার ভর অতি কম যেমন ইলেকট্রনের বা পরমাণুর। ক্রিকেট বল বা পৃথিবীর মত বড় জিনিসের তরঙ্গ-দৈর্ঘ পেতে চাইলে এই সমীকরণ থেকে তার যে মান পাওয়া যাবে তা পরিমাপের উপযুক্ত হবেনা।

তবে দ্য ব্রগলির তত্ত্ব যদি ঠিক হয় তা হলে ইলেকট্রনের মত কণিকার তরঙ্গ-দৈর্ঘ মাপা যাওয়া উচিত। স্মরণ করুন আলোকে যখন আমরা তরঙ্গ রূপে দেখেছি তখন তার ফ্রিকোয়েন্সি অথবা তরঙ্গ-দৈর্ঘ মেপেছিলাম ইন্টারফেরেন্স পরীক্ষা করে পর্দায় সৃষ্ট ইন্টারফেরেন্স প্যাটার্নে পর পর আলোকিত ও অন্ধকার অংশগুলোর দূরত্ব মেপে। তাই এবার শিগ্‌গির ইলেকট্রনের মতো কণিকার প্রবাহকে ব্যবহার করে একই রকমের পরীক্ষার আয়োজন করা হলো। ইলেকট্রন নির্গত হয় এমন উৎসের সামনে পাশাপাশি দুটি সরু কাটা জায়গার (স্লিট) ব্যবস্থা করে দুটি ইলেকট্রন প্রবাহের সৃষ্টি করা হয় যেগুলো একই জায়গা দিয়ে যায়। আলোর ক্ষেত্রে যেভাবে পর্দার ব্যবহার করা হয়েছিল সেভাবে ইলেকট্রন কোথায় কী পরিমাণে আছে পরিমাপ করার জন্য উদ্ঘাটক (ডিটেক্টর) ব্যবহার করে দেখা যায় যে এক্ষেত্রেও ইন্টারফেরেন্স প্যাটার্ন সৃষ্টি হয়েছে যার থেকে ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ হিসেব করে মতই বের করা যায় এবং তা হুবহু দ্য ব্রগলির হিসেবে করা তরঙ্গ-দৈর্ঘের সঙ্গে মিলে যায়। এভাবে পরীক্ষায়ও প্রমাণিত হলো যে বস্তু-কণিকার তরঙ্গরূপ রয়েছে। কেউ মনে করতে পারেন যে পানির তরঙ্গে যেমন অসংখ্য জলকণা তরঙ্গাকারে এক সঙ্গে আন্দোলিত হয়ে তরঙ্গরূপ নেয়, এক্ষেত্রেও অসংখ্য ইলেকট্রন কণিকা যেন একত্রে তরঙ্গ রূপ নিচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই সেরকম নয়। আমরা যদি উপরের ইন্টারফেরেন্স পরীক্ষায় ইলেকট্রনের সংখ্যা কমাতে থাকি তার ইন্টারফেরেন্স প্যাটার্নটি কম স্পষ্ট হবে কিন্তু তার মাপজোকে কোন পরিবর্তন আসবেনা। কমাতে কমাতে যদি আমরা একে একটি ইলেকট্রনে নিয়ে আসি, মজার ব্যাপার হলো তখনো ইন্টারফেরেন্স হবে! একটি ইলেকট্রন কী উপায়ে অবিভাজ্য থেকে দুটি কাটা জায়গার মধ্য দিয়ে এক সঙ্গে গিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের উপরিপাতন ঘটাচ্ছে তা খুবই চমকপ্রদ দার্শনিক প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে বটে, কিন্তু যেটি স্পষ্ট তা হলো ইলেক্ট্রনের সঙ্গেই ওতোপ্রোতোভাবে তার একটি তরঙ্গরূপ রয়েছে– একটি ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও। সে রকম যে কোন কণিকার বা ক্ষুদ্র বস্তুর সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে তার তরঙ্গরূপ রয়েছে। এমনকি বড় বস্তুর সঙ্গেও রয়েছে যদিও তা বুঝা যাবে না।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা

এরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার কোয়ান্টাম তত্ত্বের নূতন গতিবিদ্যা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জন্ম দিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত সমীকরণের মাধ্যমে যে কোন কণিকা বা কণিকা সিষ্টেমের উপর এক ধরনের তরঙ্গ আরোপ করলেন যার বিস্তারকে (এমপিøচিউড) বলা হলো ওয়েভ ফাংশন। একটি সিষ্টেমের নানা গুণ তার ওয়েভ ফাংশন থেকে পাওয়া যায়, যা আবার শ্রোয়েডিঙ্গারের সমীকরণের সমাধান থেকে আসে। এই তরঙ্গের আসল মানেটা কী? এটি দুরূহ প্রশ্ন হলেও একে অনেকটা সম্ভাবনার তরঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ এই তরঙ্গের স্পন্দনের বিস্তার (বা তীব্রতা) কোথায় কতটুকু তার হিসাব বলে দেয় ঐ কণিকাগুলোর কোথায় থাকার সম্ভাবনা কতখানি। এর মানে এ ধরনের তরঙ্গের অবতারণার মাধ্যমে কণিকার সুনির্দিষ্ট অবস্থানের কথা ভবিষ্যদ্বাণীর কোন উপায় আর রাখা গেলনা, আমরা শুধু সম্ভাবনার কথা হিসেব করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি আর অবস্থানের সেই সম্ভাবনা নানা জায়গাতেই নানা পরিমাণে থাকতে পারে। চিরায়ত নিউটনীয় বিজ্ঞান যেরকম সব কিছু এক্কেবারে সুনির্দিষ্ট ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করার দাবী করতো দেখা গেল ক্ষুদ্র কণিকার জগতে এমন দাবী অচল। এর নানা রকম সম্ভাব্যতা সূচিত করে করে এমন নানা তরঙ্গ উপরিপাতিত অবস্থায় থাকে ও নিজেদের মধ্যে ইন্টারফেরেন্স করে, যার ফলে জটিল সব বাড়তি অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই বাড়তি জটিল অংশটি ছাড়া বাকি সব কিছু চিরায়ত গতিবিদ্যার সঙ্গে অভিন্ন ফলাফল দেয়। ক্ষুদ্র কণিকার ক্ষেত্রে এই বাড়তি জটিল অবস্থাগুলো গুরচত্বপূর্ণ এবং সেগুলোই গাণিতিক ভাবে কোয়ন্টাম গতিবিদ্যার ফলাফলগুলো দিয়ে থাকে। আর এই ফলাফলগুলোকে ধর্তব্যে এনেই বিংশ শতাব্দীতে অনেক বড় বড় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। এগুলো মূলত কণিকার উপর প্রযোজ্য হলেও কণিকা সিষ্টেমের উপর নির্ভর করা বস্তুর সার্বিক গুণাগুণের অনেক ক্ষেত্রেও তা অনিবার্য ভাবে আসে।

তবে বড় কোন বস্তুকে সরাসরি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে তাতে এই কোয়ান্টাম অংশটি থাকেনা। এর কারণ হলো ওরকম বড় বস্তু অসংখ্য কণিকায় গঠিত। এদের বিভিন্নটায় উপরে উলেøখিত সেই ইন্টারফেরেন্স জনিত জটিল

বাড়তি অংশটি বিভিন্ন দিকে হয়– কোনটা ধনাত্মক দিকে (যোগ হয়) কোনটি ঋণাত্মক দিকে (বিয়োগ হয়)। এভাবে অসংখ্য কণিকার ক্ষেত্রে যোগ বিয়োগ হয়ে ঐ বাড়তি অংশটি গড়পড়তা শূন্যে পরিণত হয়। ফলে বড় জিনিসে দিব্যি চিরায়ত গতিবিদ্যার নিয়মেই ভবিষ্যদ্বাণী চলতে পারে, কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার তোয়াক্কা না করে। ব্যাট করলে ক্রিকেট বল কত বেগে কোথায় যাবে তা নির্ণয় করতে তাই কোয়ান্টাম তত্ত্বের দরকার হয়না, এমনকি মহাকাশযানের চাঁদে যেতেও দরকার হয়না। কিন্তু সেই মহাকাশযানে যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তার সবই কোয়ান্টাম তত্ত্বেরই ফসল।

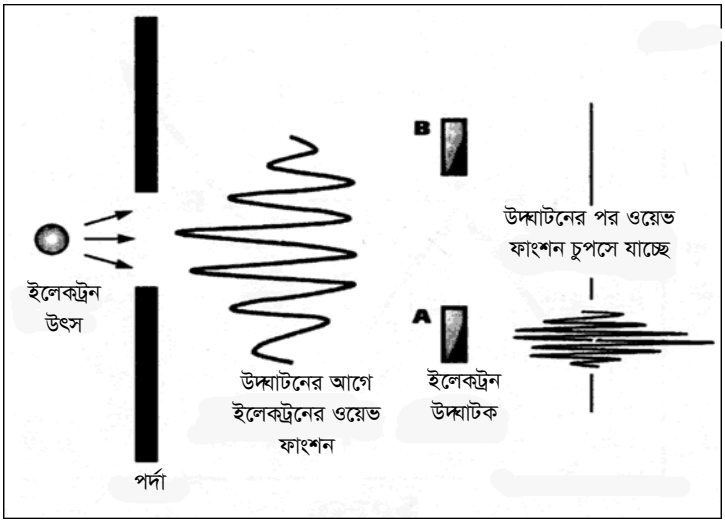

পরিমাপের আগে ইলেকট্রনের ওয়েভ ফাংশন আমরা হিসাব করে পেতে পারি যাতে A স্থানে বা B স্থানে ইলেকট্রনটির অবস্থানের সম্ভাবনাগুলো শুধু জানা যায়। পরিমাপের পর চুপসে যাওয়া ওয়েভ ফাংশন। পরিমাপের ফলে এটি নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছে ইলেকট্রনটি A স্থানে রয়েছে।

একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যতক্ষণ আমরা সত্যি সত্যি পরিমাপ না করছি, শুধু কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী হিসেব করে ভবিষ্যদ্বাণী করছি, ততক্ষণই শুধু এতে নানা সম্ভাবনা ওয়েভ ফাংশন রূপে পেতে হচ্ছে। যেই মুহূর্তে সত্যি সত্যি পরিমাপ করবো তক্ষুণি বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে, আর সম্ভাবনার ব্যাপার থাকবেনা। যেই

মুহূর্তে পরিমাপের মাধ্যমে বাস্তব উদ্ঘাটন সম্ভব হচ্ছে সেই মুহূর্তে কণিকার ওয়েভ ফাংশন চুপসে গিয়ে সুনির্দিষ্ট জায়গাতে তার অবস্থান জানা সম্ভব করে দিচ্ছে। কিন্তু ওয়েভ ফাংশন জানার ভিত্তিতেই আমরা অনেক কিছুর হিসেব-নিকেষ বা ভবিষ্যৎদ্বানী করতে পারি– যার ভিত্তিতেই কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা।

অনিশ্চয়তার নীতি

ইতোমধ্যেই আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্বে কিছুটা অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তার আভাস পেয়েছি। যেমন এখানে আমরা সুনির্দিষ্টি করে কণিকার অবস্থান ইত্যাদি নির্ণয়ের আশা ত্যাগ করেছি। হাইজেনবার্গ এই অনিশ্চয়তাকে অন্য একটি মাত্রায় নিয়ে গেছেন। তিনি অবস্থান ও ভরবেগ– কণিকার এই দুটি অবস্থাকে এক সঙ্গে বিবেচনা করে দেখিয়েছেন যে অবস্থানকে আমরা যতই নিশ্চিত ভাবে নির্ণয়ের চেষ্টা করবো ভরবেগের নির্ণয় ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। আবার ভরবেগকে যতই নিশ্চিত করার চেষ্টা করবো অবস্থান ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। যদি সত্যি সত্যি এদের একটিকে– ধরা যাক অবস্থানকে– আমরা একেবারেই সুনির্দিষ্ট করে নির্ণয় করতে পারি তা হলে ফলশ্রুতিতে ভরবেগের অনিশ্চয়তা অসীম হয়ে পড়বে, যা কিনা একটি অসম্ভব পরিস্থিতি। এই নীতিটিকে বলা হয় হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি, যা তিনি প্রকাশ করলেন এভাবে:

$$\text{অবস্থানের অনিশ্চয়তা} \times \text{ভরবেগের অনিশ্চয়তা} \geq h$$

ঐ h এর উপস্থিতিতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ এসব ঘটছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের কারণে, যার মূলে রয়েছে h এই অতি ক্ষুদ্র ধ্রুবকটি। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে অনিশ্চয়তা এটি আমাদের পরিমাপ করার সক্ষমতার কোন ঘাটতির জন্য হচ্ছেনা মোটেই, বরং এটি সকল ক্ষুদ্র জিনিসের একটি অমোঘ নিয়তি। যত নিখুঁত ভাবেই, বা যত উচ্চাঙ্গের কৌশলেই পরিমাপের চেষ্টা করিনা কেন অবস্থান ও ভরবেগ উভয়েরই অনিশ্চয়তা একেবারে কমিয়ে আনলেও h এর কাছাকাছি মানের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অনিবার্য অনিশ্চয়তা সব কিছুতে থেকেই যাবে।

এটি শুধু যে শুধু বিজ্ঞান থেকে খানিকটা নিশ্চয়তা কেড়ে নিয়ে মর্ম বেদনা ঘটানোর বিষয় তা নয়, বরং বাস্তব ক্ষেত্রেও এর তাৎপর্য অনেক। ধরুন একটি মাত্র

ইলেকট্রন নিয়ে আমাদের ঐ ইন্টারফেরেন্স পরীক্ষাটিতে ইলেকট্রনটিকে দুটি খুব সরচ কাটা জায়গার ভেতর দিয়ে একই সঙ্গে যাবার অদ্ভুত কাণ্ডটি করতে না দিয়ে জোর করে একে একটি কাটা জায়গার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি। তা হলে কী হবে? ঐ ফাঁকটুকু যদি অত্যন্ত সরচ হয় এর মধ্য দিয়ে যাবার মুহূর্তে আমরা ইলেকট্রনটির অবস্থানটি একেবারে নিশ্চিত করে বলতে পারছি যে এটি ঐ সরচ ফাঁকটুকুর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তা হলে অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ী ইলেকট্রনটির ভরবেগ অসীম রূপ লাভ করবে– অর্থাৎ স্থান-কালে সর্বব্যপ্ত হবে তার ভরবেগ– যা অসম্ভব। আসলে শেষ অবধি আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে ইলেকট্রন ঐ দুই কাটা জায়গা দিয়ে এক সঙ্গেই যাচ্ছে– অর্থাৎ তার তরঙ্গরূপ ওভাবে যাচ্ছে।

অবস্থান ও ভরবেগের যে রকম সম্পর্ক, শক্তি আর তার প্রয়োগের সময়ের মধ্যেও সে রকম সম্পর্ক। তাই অনিশ্চয়তার নীতিতে বলা যায়;

$$\text{শক্তির অনিশ্চয়তা} \times \text{সময়ের অনিশ্চয়তা} \geq h$$

এর ফলেও বাস্তব ক্ষেত্রে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে পারে। ক্ষুদ্র কণিকাদের জগতে আমরা যদি তার শক্তি প্রায় নিশ্চিত করে নির্ণয় করে বলতে পারি, এবং দেখি যে এটি একটি নির্দিষ্ট বাধা অতিক্রম করতে পারার মত যথেষ্ট নয়, তা হলে দেখা যাবে সেই বড় বাধা অতিক্রম করার একটি ছোট কিন্তু সসীম সম্ভাবনা এই ছোট শক্তিরও থাকে, এবং অনেক কণিকার মধ্যে কিছু কিছু কণিকা সত্যি সত্যি এই বাধা অতিক্রম করেও। এর কারণ শক্তি প্রায় নিশ্চিত হওয়ায় সে শক্তি কার্যকর হবার সময় প্রায় অসীমের কাছাকাছি হয়ে পড়ে। এর মধ্যে শূন্য স্থান-কাল থেকে বাড়তি শক্তি নিয়ে তা আবার কাজ শেষে ফেরৎ দেয়ার মত সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়। এরকম পার হয়ে যাওয়া যদিও চিরায়ত গতিবিদ্যায় সম্ভব নয়, তবু

চিরায়ত বিজ্ঞানের নিয়মে যথেষ্ট শক্তি না থাকলে বাধা অতিক্রম অসম্ভব

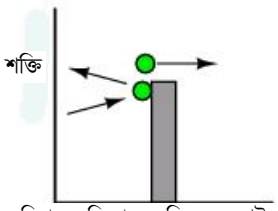

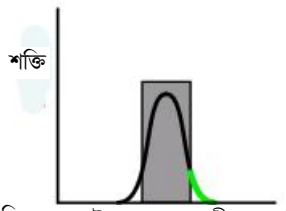

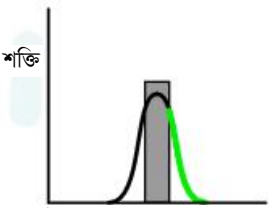

কেয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী কম শক্তির কণিকার সম্ভাবনা তরঙ্গ বাধার উল্টো দিকেও বিস্তৃত হতে পারে। বাধা পাতলা হলে এ সম্ভাবনা বাড়ে।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যায় সম্ভব বলে একে বলা হয় বাধার মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে যাওয়া বা টানেলিং এফেক্ট। এ যে শুধু তাত্ত্বিক ভাবে প্রমাণিত তাও নয়। কারণ পরমাণুকেন্দ্র থেকে শক্তিশালী বলের আকর্ষণের বাধা অতিক্রম করে আলফা কণিকা নামক কণিকা অল্প শক্তি নিয়েও বের হয়ে আসতে পারে যার ব্যাখ্যা শুধু এরকম টানেলিং এর মাধ্যমেই সম্ভব। আবার এভাবেই এসেছে টানেল ডায়োড নামের আধুনিক ইলেকট্রনিক কৌশল যা কোয়ান্টাম তত্ত্বের টানেলিং এফেক্ট ছাড়া সম্ভব হতো না।

পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। বিজ্ঞান লেখক। অর্ধশতাব্দী ধরে প্রকাশিত মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের (সিএমইএস) প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার। বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বিভিন্ন স্বীকৃতি প্রাপ্ত লেখক।